চোরা বালী
রোমেনা আফাজ

দস্যু বনহুর সিরিজ

চোরাবালি-৬৯

রোমেনা আফাজ

সালমা বুক ডিপো

৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

হুসনা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দাঁড়ালো, ভয়ার্ত এবং কম্পিত কণ্ঠে বললো—জেলে বাবা......জেলে বাবা সর্বনাশ হয়েছে......কে বা কারা বাবুকে তীর বিদ্ধ করেছে......

জেলে বুড়ো জালের ছেঁড়া অংশগুলো গেঁথে নিচ্ছিলো, হুসনার কথা শুনে চিৎকার করে উঠে—বাবুকে তীর মেরেছে!

হাঁ বাবা তীর মেরেছে। বিষাক্ত তীর, বাবু তীর বিদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে...

বলিস কি মেয়ে? জেলে বুড়ো জাল ছুড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়, চোখে মুখে তার উদ্বিগ্নতার ছাপ ফুটে উঠেছে, সে তাড়াতাড়ি দাওয়ার নিচে দাঁড়িয়ে মুখের কাছে হাত রেখে খুব জোরে চিৎকার করে ডাকলো ও-হো-ওহো হো—হো...

সঙ্গে সঙ্গে যে যেখানে যা করছিলো হাতের কাজ ফেলে ছুটে আসে, ছেলে বুড়ো যুবক বৃদ্ধ বৃদ্ধা সবাই এসে ঘিরে দাঁড়ায় বৃদ্ধ জেলের চারপাশে। সকলের মুখেই আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠে। তাকিয়ে আছে সবাই সর্দারের মুখের দিকে না জানি কি বিপদ ঘটেছে—কে জানে।

জেলে বুড়ো বৃদ্ধ হলেও তার কণ্ঠ ছিলো বজ্রের মত প্রচণ্ড এবং কঠিন। জেলে পাড়ার জেলেদের উপর কোন বিপদ এলে জেলে সর্দার তাদের এ ভাবেই আহ্বান জানিয়ে থাকে তখন জেলেরা ছুটো এসে ঘিরে দাঁড়ায়, জেলে বুড়ো বিপদ বার্তা জানিয়ে কাজের নির্দেশ দেয়।

আজ জেলে বুড়োর চিৎকার শুনে সবাই ছুটে এসেছে, প্রতীক্ষা করছে নির্দেশের।

জেলে বললো—তোরা হা করে কি দেখছিস বাবুকে কারা তীর মেরেছে বিষাক্ত তীর শীগীগরই চল।

বুড়ি হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছে। বাবু আর হুসনাকে সে নিজের ছেলে মেয়ের মত মনে করে। ওদের মন্দ চিন্তা সে করতেই পারেনা। বুড়ি কাঁদছে আর বলছে—হায়রে বাবুর কি হলো, বাবুর কি হলো।

বুড়ির কান্নায় জেলেনীরা সবাই প্রায় কাঁদতে শুরু করে দেয় কারণ তারা সকলেই বাবুকে খুব ভালবাসতো।

বৃদ্ধ জেলে বুড়িকে লক্ষ্য করে বলে উঠলো—বুড়ি আমার ঘরের দক্ষিণ কোণে একটা ভাঁজে ওষুধ পোঁতা আছে তুই মাটি খুঁড়ে ঐ ভাঁড় বের করে নিয়ে আয়। আমি চললাম...মেইয়া বাবু কোথায়?

হুসনার মুখ রক্ত শূন্য হয়ে পড়েছে, অসহায় চোখে তাকাচ্ছে সে জেলেদের দিকে। হুসানা জানে এ অজানা অচেনা দ্বীপে একমাত্র মিঃ মনির চৌধুরী ছাড়া আর কেউ নেই তাই সে বেশি বিচলিত হয়ে পড়েছে। জেলে বুড়োর কথায় বললো হুসনা ঐ দিকে সমুদ্র তীরে... এসো বুড়ো বাবা আমি তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। হুসনা প্রায় ছুটতে শুরু করে।

হুসনাকে অনুসরণ করে এগিয়ে চলে জেলে বুড়ো এবং তার দলবল।

যাবার সময় বুড়ো জেলে এবং পুরুষ জেলেরা সবাই যে যার অস্ত্র নিয়ে চলে। মেয়েরা যাবার জন্য পা বাড়াতেই জেলে বুড়ো তাদের নিষেধ করে—তোরা ঘরে থাক্।

মেয়েরা তাই করলো, ওরা ঘরেই রইলো।

বনহুর নিঃস্তব্দ অসারের মত পড়ে আছে। রক্তে ভেসে গেছে সমুদ্র তীরের শুষ্ক বালুর কিছু অংশ। চারিদিক নিঃস্তব্ধ, সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ আছড়ে পড়ছে তার পায়ের কাছে।

বৃদ্ধ জেলে হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়ে বনহুরের পাশে প্রথমে সে ওরে বুকে কান লাগিয়ে দেখে নেয় তারপর দ্রুত গলায় বলে, মংলু শীগগীর যা ভাঁড় তুলেছে নিয়ে আয়।

সঙ্গে সঙ্গে মংলু বলে এক তরুণ জেলে সে দিলো ছুট।

জেলে বুড়োর মুখ ভার দেখে সবাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠে, বুঝতে পারে জেলে সর্দার বাবুর জন্য অত্যন্ত ঘাবড়ে উঠেছে। সে বার বার কিছু মন্ত্র পাঠ করে বনহুরের বাজুর ক্ষতটায় ফুঁ দিচ্ছিলো।

হুসনা আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলো, কারণ ক্রমেই বনহুরের মুখ নীলাভ হয়ে উঠছে।

জেলেরা এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ী করছে।

একজন বলে উঠে—বাবু বাঁচবেনা রে মহুয়া।

মহুয়া কাঁদো কাঁদো গলায় বলে—সত্যি বাবু বড় ভালো লোক ছিলো।

জেলেদের মধ্যে একটা জোয়ান ছিলো নাম তার রাজু। যেমন বলিষ্ঠ চেহারা তেমনি সাহসী। মনটা ছিলো ওর খুব ভালো।

রাজু চুমকীর স্বামী।

যে মুহূর্তে হুসনা গিয়ে জেলে বুড়োকে সংবাদ দেয় ঐ সময় রাজু ছিলো না। সে গিয়েছিলো নৌকা নিয়ে সমুদ্রে কোন কাজে।

ফিরে আসতেই তাকে চুমকী বলে—রাজু বাবুর খুব বিপদ হয়েছে। তাকে কে যেন তীর মেরেছে।

কথাটা শুনে রাজু এক দন্ড অপেক্ষা না করে ছুটে এসে পড়ে সেখানে। ব্যস্ত কণ্ঠে বলে রাজু—বাপু বলো কে বাবুকে তীর মেরেছে? বলো আমি তাকে দেখে নেবো।

জেলে বুড়ো বলে—রাজু আগে বাবুকে বাঁচিয়ে তুলি তারপর দেখে নেবো কে বাবুকে তীর মেরেছে।

এমন সময় মংলু আর বুড়িমা ছুটে আসে তাদের হাতে ভাঁড়।

জেলে বুড়ো ভাঁড় হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি খানিকটা ওষুধ ভাঁড় থেকে নিয়ে বনহুরের ক্ষত স্থানে লাগিয়ে দেয় তারপর বলে—এবার দেখবো বাবু কেমন করে মরে। জেলে বুড়োর মুখোভাব প্রসন্ন হয়ে আসে। হুসনার মাথায় হাত রেখে বলে—কাঁদিস না মেয়ে বাবু আর মরবেনা। এ ওষুধ সব থেকে বড় ওষুধ। জ্ঞান চলে গেলে আর বাঁচাতে পারতামনা। বাবুর জ্ঞান আছে বাবু বাঁচবে তুই কাঁদিস না।

রাজুও ঝুঁকে হয়ে তুলে নেয় তীরখানা, যা এতোক্ষণ কারো নজরে পড়েনি। সবাই বাবুকে নিয়ে ব্যস্ত তীরের দিকে তাকাবার সময় ছিলো না কারো। রাজু তীরখানা হাতে তুলে নিয়েই বলে উঠলো—বাপু দেখছিস এ তীর জংলী রাণীর।

সকলের দৃষ্টি রাজুর হাতের তীরখানায় এসে পড়লো।

বৃদ্ধ রাজুর হাত থেকে তীরখানা নিয়ে সাবধানে নাড়াচাড়া করে পরীক্ষা করলো, তারপর বললো—ঠিক বলেছিস রাজু এ তীর জংলী রাণীর।

জেলেদের ছোটবড় সকলের মুখ মন্ডল কালো হয়ে উঠলো। কারণ এরা জানে তাদের এ দ্বীপে জংলী রাণীর আধিপত্য কতখানি। জেলে বুড়ো জংলীদের ভয় করে না। জংলীরা যদি কোন কোন সময় তাদের গ্রামে হানা দেয় তখন জেলে বুড়ো তার জোয়ানদের নিয়ে পালটা আক্রমণ চালায়। দু'পক্ষের হতাহত হয় তবু জেলেরা জংলীদের হাতে ধরা দেয় না।

আজও যখন জেলে বুড়ো জেলেদের নিয়ে বাবুর কাছে যাচ্ছিলো তখন সে মেয়েদের সঙ্গে নেয়নি এবং পুরুষদের সবাইকে যার যার অস্ত্র নিয়ে চলতে বলেছে। সে জানে হঠাৎ যদি জংলীরা তাদের উপর আক্রমণ চালায় তাহলে যেন তারা পরাজিত না হয়।

কিন্তু জেলে বুড়োও ভয় করে এই জংলী রাণীটিকে। জংলী রাণী আসলে জংলীদের রাণী নয় সে জংলী সর্দারের মেয়ে। বড় দুর্দান্ত এই মেয়েটা। তাই জেলে পাড়ার সবাই একে জংলী রাণী বলে। সর্দার ওর হাতে তীর ধনু থাকেরেই। খুশিমত সে বিচরণ করে সব জায়গায়। ইচ্ছা হলে সে তীর বিদ্ধ করে হত্যা করে নিরীহ মানুষজনকে। জংলী রাণীর তীরের ফলায় রয়েছে বিষ।

একবার এ তীর বিদ্ধ হলে মৃত্যু তার অনিবার্য।

কিন্ত জেলে বুড়োর এক মহা ঔষধ আছে যা সব কিছু বিষকে বিনষ্ট করে দেয়। শুধু বিষ নয়, সাপের বিষকেও সচ্ছ করে দেয় এই ঔষধ।

বৃদ্ধ বলে—জংলী রাণী বাবুকে এ তীর ছুড়ে মেরেছে। নিশ্চয়ই সে আশে পাশে কোথাও ছিলো।

রাজু বললো—বাবুকে জংলী রাণী তীর মেরে পালিয়ে যাবে আর আমরা চুপ করে দেখবো বাপু। তুমি হুকুম দাও আমি জংলী রাণীকে খুঁজে বের করি।

জেলে বুড়ি বলে উঠে—না বেটা তোকে আমি যেতে দেবো না। জংলী রাণী তোকেও মেরে ফেলবে।

জেলে বুড়ো বললো—রাজু আমি হুকুম দিলাম তুই যা। বাবুকে তীর মেরে জংলী রাণী পালিয়ে যাবে এ হবে না। যা রাজু আমি বাবুর কাছে আছি তুই যা।

রাজু বর্শা হাতে উঠে দাঁড়ায়।

জেলে বুড়ি স্বামীর কথার পর আর কিছু বলতে পারেনা, শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়।

অবশ্য চুমকী কাছে থাকলে সে স্বামীকে জংলী রাণীর সন্ধানে যেতে দিতোনা। তবে বাবুর জন্য হয়তো সে মানাও করতে পারতোনা। কারণ বাবু আর তার বৌকে ওরা প্রাণের চেয়েও ভালবাসে। হুসনা যে বাবুর বৌ নয় এ কথা তারা আজও জানেনা। ইচ্ছা করেই বনহুর এবং হুসনা কথাটা চেপে আছে ওদের কাছে। যদি সত্য কথা বললে নতুন কোন অসুবিধা দেখা দেয়। বনহুরই হুসনাকে বুঝিয়ে বলেছিলো সে যেন ওদের কথায় বা কাজে অসন্তুষ্ট না হয়।

আজ হুসনার মুখের দিকে তাকিয়ে তাই রাজু স্থির থাকতে পারেনি, সে চলে গেলো জংলী রাণীর সন্ধানে।

জেলেরা বনহুর আর হুসনাকে নিয়ে ফিরে এলো জেলে পাড়ায়। চললো বাবুকে নিয়ে নানা রকম চিকিৎসা। তবে জেলে বুড়োর ওষুধই কাজ করলো। সমস্ত দিন কেটে যাবার পর রাতে বনহুর ধড়মড় করে উঠে বসলো বিছানায়। তার যেন কিছু হয়নি এমনি ভাব।

জেলে বুড়ো বনহুরের ক্ষতস্থানে খানিকটা ঔষধ লাগিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছিলো। যতক্ষণ বাবু সেরে না উঠে ততক্ষণ তার দু'পাশে জেলেবুড়ো আর জেলে বুড়ি বসেছিলো যেমন করে বসে থাকে রুগ্ন সন্তানের দু'পাশে তাদের বাবা মা ঠিক তেমনি।

হুসনা শুধু এতোক্ষণ অশ্রুবিসর্জন করে চলেছিলো। তার মনে কোন ভরসা ছিলো না বিষাক্ত তীর বিদ্ধ হবার পর কেউ কি বাঁচে। নিরাশ হৃদয়ে প্রতীক্ষা করছিলো সে হঠাৎ যদি বেঁচে উঠে তাদের কত আনন্দ হবে তার।

বনহুর বিছানায় উঠে বসতেই হুসনা আনন্দ উচ্ছল কণ্ঠে বললো—মিঃ চৌধুরী আপনি বেঁচে গেলেন?

জেলে বুড়ো এবং বুড়িও খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।

বনহুর বলে—কেনো আমার কি হয়েছিলো মিস হুসনা।

বলে হুসনা—আপনি বিষাক্ত তীর বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছিলেন। জেলে বাবা এবং বুড়ি মার দয়ায় বেঁচে গেলেন।

বনহুর ধীরে ধীরে স্মরণ করতে চেষ্টা করে কি হয়েছিলো তার। মনে পড়ে সমুদ্র বালু চরে বসেছিলো সে আর হুসনা। হঠাৎ একটা তীর এসে বিদ্ধ হয় তার বাহুতে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করেছিলো সে ঐ সময়, তারপর আর কিছু মনে নাই।

বনহুর তাকায় তার ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজের মত করে বাঁধা জায়গাটায়। সত্যি মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে উঠলো, আশ্চর্য জেলে বুড়োর ঔষধের শক্তি বনহুর ছেলে বুড়িকে জড়িয়ে ধরলো বুকে—জেলে বাবা একবার নয় তুমি দু'বার আমাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করলে। তোমাকে দেবার মত আমার কিছু নাই—আমার ভালবাসা তুমি গ্রহণ করো।

জেলে বুড়োও বনহুরকে জড়িয়ে ধরে বুকে, সন্তানহীন বৃদ্ধের গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে দু'ফোটা অশ্রু। হয়তো বা এ তার আনন্দ অশ্রু।

❑

বনহুর আর হুসনা তাকিয়ে আছে জেলে বুড়োর হাতে সেই বিষাক্ত তীর খানার দিকে। জেলে বুড়ো বলে চলেছে—জংলী রাণী বড় শয়তানী মেয়ে। ও খেয়াল মত যাকে খুশি এই বিষাক্ত তীর ছুঁড়ে মেরে দেয়। এমনি করে সে বহুলোক আর জীব জন্তুকে খুন করেছে। সব সময় সে ঘুরে বেড়ায় জঙ্গলে আর সমুদ্রের ধারে ধারে। জানিস বাবু ওকে? জংলী রাণী আসলে জংলী সর্দারের মেয়ে নয়।

বনহুর আর হুসনা বলে উঠে—তবে সে কে?

সে অনেক কথা পরে বলবো।

হুসনা বলে উঠে—না বাবা তুমি বলো।

জেলে বুড়ো বললো—বাবু এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ নয় তাই পরে একদিন শোনাবো...

বনহুর বলে—বাবা তুমি বলো আমি এখন বেশ সুস্থ আছি।

বুড়ি মস্ত এক বাটি দুধ এনে বলে—খেয়ে নে বেটা—দুধ খেয়ে নে।

বনহুর ফেলতে পারেনা বৃদ্ধার কথা, দুধের বাটি হাতে নিয়ে এক নিশ্বাসে খেয়ে বাটিটা বৃদ্ধার হাতে ফিরিয়ে দেয়। তারপর হাতের পিঠে ঠোঁট দু'খানা মুছে নিয়ে বলে—বুড়ি মা, সত্যি তোমরা আমাদের মা- বাপ—না হলে সন্তানদের এতো ভালবাসো?

হাসে বৃদ্ধা, তারপর বাটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে যায় কুঠিরের মধ্য থেকে।

বনহুর বলে এবার—বলো বাবা কে সে জংলী মেয়ে?

জেলে বুড়ো বললো—তবে একটু সবুর কর আমি জালটা নিয়ে আসি বসে বসে জাল মেরামত করবো আর জংলী মেয়ের কাহিনী শোনাবো।

বেরিয়ে যায় জেলে বুড়ো।

হুসনা বলে—বিশ্বাস করুন আমি একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিলাম। আপনাকে আবার ফিরে পাবো ভাবতে পারিনি।

বনহুর বললো—আপনার ভাবাটা মিথ্যা নয়। যে বিষ আমার দেহে প্রবেশ করেছিলো এতে আমার বাঁচাটা বিস্ময় ছাড়া কিছু নয় মিস হুসনা।

সত্যি আপনি না থাকলে আমি আত্নহত্যা করতাম।

কেনো? কেনো আপনি আত্নহত্যা করতেন? মিস হুসনা আপনি ভুল করতেন কারণ যে কোন মুহূর্তে আমার নতুন বিপদ আসতে পারে তাই বলে আমার অভাবে আপনি আত্নহত্যা করবেন?

আপনার অভাবে আমি এক মুহূর্ত থাকতে পারবোনা মিঃ চৌধুরী এ দ্বীপে আমি কি নিয়ে বাঁচবো বলুন?

এমন সময় জেলে বুড়ো জাল হাতে নিয়ে প্রবেশ করে কুঠিরের মধ্যে। একটা বাঁশের তৈরি জলচৌকির উপর বসে জালখানা সামনের খুঁটির সঙ্গে এনে বেঁধে নেয় তারপর হাত চলার সঙ্গে সঙ্গে মুখও চলতে থাকে—আজ থেকে বিশ বছর আগে, নৌকা নিয়ে আমরা জেলের দল সমুদ্রে মাছ ধরতে

গিয়েছিলাম। আগের দিন খুব জোরদার একটা ঝড় হয়ে গেছে । সাইক্লোন ধরনের বড় ঝড় আমরা সেদিন মাছ ধরতে ধরতে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলাম। মাছও পেয়েছি অনেক, ফিরবো এমন সময় দেখলাম দূরে অনেক দূরে একটা বোট নৌকা ভেসে যাচ্ছে। আমি আমার দলবলকে বললাম; ওরে চল্ দেখি ঐ বোট নৌকায় কি আছে। আরও বললাম কোন মানুষ থাকতে পারে। কেননা গতরাতে খুব ঝড় হয়েছে হয়তো কোন জাহাজ ডুবে গেছে এ বোট নৌকা তারই হবে আর ওর মধ্যে কোন বিপদে পড়া লোক থাকতে পারে। আমার সঙ্গীরা তখন বাড়ি ফিরে আসার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কেউ ঐ বোট নৌকা দেখার জন্য আমার সঙ্গে যেতে চাইলোনা।

থামলো জেলে বুড়ো।

বনহুর আর হুসনা উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনছে।

বলতে শুরু করে আবার সে। ওরা কেউ না গেলেও আমি আমার নৌকা নিয়ে অগ্রসর হলাম। সেদিন সমুদ্র শান্ত ছিলো তাই অল্প সময়ে আমি নৌকা নিয়ে বোটখানার পাশে পৌঁছে গেলাম। বাবু কি দেখলাম জানো? দেখলাম একটা মেয়ে মানুষ বোটের মধ্যে মরে পড়ে আছে তার পাশে একটা নবজাত শিশু। শিশুটি হাত পা নাড়ছে আর কাঁদবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ছোট্ট বাচ্চা তাই গলা শুকিয়ে গেছে, কাঁদার কোন শব্দ বের হচ্ছেনা। রোদে কালো হয়ে উঠেছে এক রত্তি বাচ্চাটা। আমি বুঝতে পারলাম শিশু সন্তানটা জন্মাবার পর পরই ওর মা মরে গেছে। কি করবো আমার নৌকাখানা ভিড়িয়ে নিলাম বোটখানার সঙ্গে। তারপর একলাফে বোটখানায় পৌঁছে বাচ্চাটাকে তুলে নিলাম কোলে। বাচ্চাটার শরীরে তখন জন্মাবার পর যে রক্ত লেগে থাকে সেই রক্ত লেগেই রয়েছে, তাড়াতাড়ি ওকে কোলে তুলে নিলাম। একবার তাকিয়ে দেখলাম, মা যেমন ঘুমিয়ে থাকে তেমনি ঘুমিয়ে আছে বাচ্চার মা। আমি বাচ্চা নিয়ে আমার নৌকায় চলে আসবো তখন আমার মন বললো তুই বাচ্চা নিয়ে চলে যাচ্ছিস মাকে সামলাবিনা? আমি তখন বাচ্চাটাকে আবার বোট নৌকাখানার মধ্যে শুইয়ে রেখে মায়ের লাশটা তুলে নিলাম হাতে তারপর ধীরে ধীরে সমুদ্রের পানিতে ভাসিয়ে দিলাম।

থামলো আবার জেলে বুড়ো।

হুসনা আর বনহুর নিশ্বাস বন্ধ করে শুনে যাচ্ছিলো।

বলতে শুরু করলো জেলে বুড়ো—বাচ্চা নিয়ে আমার নৌকায় ফিরে এলাম তারপর এক হাতে দড়িটা খুলে দিলাম বোট নৌকা থেকে। হাঁ বাবু বোট নৌকাখানার সঙ্গে আমার নৌকাটা বেঁধে নিয়ে তারপর বোট নৌকায় উঠেছিলাম। না হলে সমুদ্রের ঢেউ এর সঙ্গে ভেসে যেতো আমার নৌকাখানা। বাবু বাচ্চাটা ভারী ফুটফুটে আমার খুব ভাল লাগলো। আমি আমার নৌকায় কোলে নিয়ে বসে একটু পানি আংগুল দিয়ে খাওয়ালাম। জানিস বাবু নৌকায় সেদিন খাবার পানি ছিলো তাই হয়তো বাচ্চাটাকে বাঁচাতে পারলাম। না হলে ঠিক মরে যেতো কিন্তু না মরেই বা কি হলো।

ব্যথা ভরা একটা করুণ ভাব ফুটে উঠলো জেলে বুড়োর মুখে। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললো জেলে বুড়ো, বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে এক হাতে বৈঠা চালাচ্ছি। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আমার সঙ্গী সাথীরা সব ফিরে গেছে, জানিস বাবু তখন আমি সর্দার ছিলামনা। সর্দার হলে আমাকে ছেড়ে চলে যেতে পারতোনা। আর বাচ্চাটাকেও আমি হারাতাম না।

বনহুর বললো—কি হলো তারপর বাবা বলো। তোমার গল্প সত্যি বড় আশ্চর্য লাগছে। বাচ্চাটাকে তুমি কি করে হারালে?

হাঁ সেই কথাই বলবো, শোন বাবু আমি বৈঠা বেয়ে আসছি এমন সময় আমার সামনে আট দশখানা নৌকা এসে আমাকে ঘিরে ফেললো। আমি বুঝতে পারলাম জংলীদের নৌকা সেগুলো জানতাম জংলীরা খুব শয়তান তুব আমি ওদের কিছু না বলে পিছু হঠতে লাগলাম।

জংলীরা আমার নৌকা আটক করে ফেললো। জংলী সর্দার নিজে আমার নৌকায় এসে সব মাছ নিয়ে নিলো। আমি ভাবলাম যা হোক মাছ নিয়েই ওরা আমাকে রেহাই দেবে কিন্তু তা দিলোনা। জংলী সর্দার আমার কোল থেকে বাচ্চাটা কেড়ে নিলো তারপর আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো সমুদ্রের মধ্যে। তারপর জংলীরা আনন্দ করতে করতে চলে গেলো।

আমি কি করলাম জানিস বাবু, ওরা যতক্ষণ নৌকা নিয়ে সরে না গেলো ততক্ষণ ডুব সাঁতার কেটে ডুবে রইলাম। ওরা চলে যেতেই এসে

নৌকায় চেপে ফিরে এলাম বাড়িতে কিন্তু সেই কথা কাউকে বললামনা। বললে আমার সঙ্গীরা হাসি তামাসা করবে। বলবে জংলীদের সঙ্গে পারিস নি, হেরে গেছিস। লজ্জায় আমার মুখে চুন কালি পড়তো তাই না বলে চুপ থাকলাম। এমন কি বুড়িকেও বলিনি। তখন অবশ্য সে বুড়ি ছিলোনা। বাবু কে জানতো বাচ্চাটা আমার মনে দাগ কাটবে। আমি বাচ্চাটাকে খুব ভালবেসে ফেলেছিলাম।

কি যেন ভাবতে লাগলো জেলে বুড়ো তারপর বলতে শুরু করলো— আমি মাছ ধরতে গেলে সব সময় মনে ঐ বাচ্চার চিন্তা হতো। বড় দেখতে ইচ্ছা হতো। কোলে নিতে ইচ্ছা করতো, মাছ ধরতে পারতাম না। একদিন আমি মাছ ধরার নাম করে জঙ্গলে গেলাম। চুপি চুপি জংলীদের নজর এড়িয়ে এক সময় পৌঁছে গেলাম জংলী সর্দারের আস্তানায়। ওরা আমাকে দেখে ফেলতে পারে এজন্য আমি একটা গাছে চেপে নজর রাখলাম জংলীদের আস্তানার দিকে। বেশি সময় আমাকে কাটাতে হলোনা বাবু, আশা আমার পূরণ হলো। দেখলাম একটা ভূতের মত কালো মেয়ে ফুলের মত সুন্দর ফুটফুটে বাচ্চাটাকে কোলে করে আদর করছে। পাশেই তার জংলী সর্দার তাকিয়ে তাকিয়ে বাচ্চাটাকে দেখছে। বুঝতে পারলাম ঐ জমকালো মেয়েলোকটা সর্দারের বৌ। জংলী সর্দার বাচ্চাটাকে নিয়ে গিয়ে বৌকে দিয়েছে। ভাবলাম যাক তবু মেরে ফেলেনি বা খেয়ে ফেলেনি।

হুসনা বলে উঠলো—জংলীরা মানুষ খায়?

বনহুর বললো—হাঁ অনেক মানুষ আছে যারা মানুষ খায় মিস হুসনা।

সত্যি!

হাঁ সত্যি। বাবু ঠিক বলেছে, জংলীরা সাদা মানুষ দেখলে ওরা তাকে হাত পা বেঁধে আগুনে পুড়িয়ে খায়। যাক তবু বাচ্চাটা বেচে আছে দেখে খুশি হলাম, ফিরে এলাম বাড়িতে। কিন্তু সেদিনের পর থেকে প্রতি সপ্তাহে একবার করে গিয়ে গাছের ডালে বসে দেখে আসতাম মেয়েটাকে। হাঁ বাবু বাচ্চাটা পুরুষ ছিলোনা, ছিলো মেয়ে। দেখতে দেখতে মাস গেলো বছর গেলো, বছর গেলো তারপর যুগ হলো। সেদিনের ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েটা

একদিন জোয়ান হলো। কিন্তু সে দেখতেই সুন্দর হলো, মনটা হয়ে গেলো ঠিক জংলীদের মত। কথা সে আমাদের মত বলতে পারে না, জংলীদের মত কাঁচা মাংস খায় আর জংলীদের মতই সে হয়ে উঠে ভয়ঙ্কর। সর্বদা সে একটি বিষাক্ত তীর ধনুক নিয়ে বিচরণ করে ফেরে, যাকে খুশি মেরে দেয়। খুন করে সে ইচ্ছা মত। বাবু আজ যদি মেয়েটা আমার কাছে মানুষ হতো তা হলে......গলাটা বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে, একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বলে—সে অনেক ভাল হতো। আমি তাকে বিয়ে দিতাম, নিজের মেয়ের মত থাকতো, ওর ছেলে মেয়ে হতো কিন্তু তা হলোনা। জানিস বাবু আমার এ বুকে বহুৎ জ্বালা। নিজের কোন সন্তান নেই, তাই এতো আফসোস......

কথা শেষ করে গামছায় চোখ মুছে জেলে বুড়ো। বনহুর আর হুসনাই চোখে মুখে বিস্ময়। তাদের মন তখন চলে গেছে সেই বিশ বছর আগে, সমুদ্রের বুকে ভেসে চলেছে একটা বোট নৌকা তার মধ্যে একটি যন্ত্রণা কাতর নারী, কোন এক মুহূর্তে সে প্রসব করে এক শিশু কন্যা তারপর সে মৃত্যু বরণ করে আর সেই শিশু কন্যাটি অসহায় অবস্থায় মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকে কিন্তু তাকে বাঁচিয়ে নেয় জেলে বুড়ো......

সম্বিৎ ফিরে আসে বনহুর আর হুসনার।

জেলে বুড়ো বলছে—বাবু ঐ শয়তানীকে আমার বড় ভয়। একদিন যাকে আমি বাঁচালাম আজ সেই কিনা আমার জেলেপাড়ায় হামলা চালিয়ে লোকদের খুন করে। দেখলি না বাবু তোকে কেমন জখম করেছিলো।

বনহুরের ভ্রু'কুঁচকে উঠে—কিছু যেন ভাবে সে মনে মনে তারপর বলে—জেলে বাবা তোমাকে কথা দিলাম—ঐ জংলী রাণীকে আমি এনে দেবো তোমার হাতে.....

এই তুই কি বলছিস বাবু?

হাঁ দেবো শুধু তাই নয় ওকে তুমি জংলী মেয়ে নয় তোমার মেয়ের মত করে পাবে।

বাবু!

হাঁ বাবা তুমি আমাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করেছো আমি তোমার এ উপকারটুকু করবো। তুমি তাকে মেয়ের মত করেই পাবে।

জেলে বুড়োর চোখ দুটো আনন্দে চকচক করে উঠলো। সে জালটা গুটিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললো —বাবু চেষ্টা করে কি হবে পারবিনা বাবু পারবিনা। কেউ পারবেনা জংলী রাণীকে মানুষ করতে। বেরিয়ে গেলো জেলে বুড়ো।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো, যদিও তার শরীরটা এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ নয়। হাতে তার ব্যান্ডেজ বাধা। এসে দাঁড়ালো বনহুর কুঠিরের এক পাশে যেখানে জানালাটা রয়েছে। জানালা বলতে ঝাপের একটি খন্ড বাঁশের খুটি দিয়ে উচু করে রাখা হয়েছে। ঐ জানালা দিয়ে বনহুর তাকায় সম্মুখে বিস্তৃত বেলাভূমির দিকে। জংলী রাণী আসলে তাহলে জংলী নয়? সভ্য সমাজে তার জন্ম কিন্তু পরিবেশ তাকে অমানুষ করে তুলেছে......কথাটা মনে হতেই হাসি পায় তার, নিজের কথা স্মরণ হয় সেও তো একজন সভ্য সমাজের সন্তান কিন্তু পরিবেশ তাকে দস্যু হতে সহায়তা করেছে। আজ তার নাম উচ্চারণ করতে সভ্য সমাজের মানুষ ভয় পায়। শুধু ভয় নয় শিউরে উঠে অনেকের শরীর। হৃদপিণ্ড ধক্ ধক্ করতে থাকে। কারণ তার এমন একটা রূপ আছে যা অতি ভয়ঙ্কর—হঠাৎ হেসে উঠে বনহুর—হাঃ হাঃ হাঃ———

হুসনা চমকে উঠে বিস্ময় ভরা চোখে তাকায় বনহুরের দিকে কারণ সে কোন সময় বনহুরকে এমনভাবে হাসতে দেখেনি। উঠে এসে বলে হুসনা—মিঃ চৌধুরী হাসছেন যে বড়? কেনো হাসছেন বলুন?

ফিরে তাকালো বনহুর হুসনার দিকে।

হুসনা তাকিয়ে আছে বনহুরের মুখ মন্ডলের দিকে, দু'চোখে তার বিস্ময়।

বনহুর বললো—মিস হুসনা জেলে বাবা বললো—জংলী রাণী অমানুষ হয়ে গেছে তাই আমার হাসি পেলো।

এতে হাসি পাবার কি আছে ঠিক বুঝতে পারলাম না।

মিস হুসনা যদি বলি আমিও সভ্য সমাজের সন্তান হয়েও একজন অমানুষ?

বাজে কথা বলছেন।

অসম্ভব কিছুই নয় মিস হুসনা। অসম্ভব কিছুই নয়, মনে করুণ আমরা যদি এই জেলেদের মধ্যে দিনের পর দিন কাটাতে থাকি। বছরের পর বছর, কোন দিন যদি আর স্বদেশে ফিরে যেতে না পারি তাহলে আমরা কি জেলেদের মত হয়ে যাবোনা? মানে সম্পূর্ণ জেলেই বলে যাবো আমরা একদিন তাতে কোন সন্দেহ নাই। তেমনি জংলী রাণী তার অসামাজিক জীবন লাভ করেছে তার পরিবেশের জন্য। এ কথাই মনে করে হাসছিলাম।

হুসনা এবার চিন্তিতভাবে বললো—না জানি সে কার মেয়ে? কে তার বাবা? মা তো মারাই গেছে ওর বাবাও কি মারা গেছে কে জানে?

বনহুর বলে—হয়তো বেঁচেও থাকতে পারে। যেমন ধরুন আপনি জাহাজে, আপনার বাবা মা এরা আছেন কান্দাই। খোদা না করুন আপনি যদি মৃত্যুবরণ করতেন, আপনার বাবা-মা বেঁচেই থাকতেন এবং আছেন। তেমনি হয়তো ওর বাবাও বেঁচে থাকতে পারে।

আচ্ছা মিঃ চৌধুরী জংলী রাণীকে সভ্য মানুষে পরিণত করা যায় কি?

আমিও সেই কথাই ভাবছি মিস হুসনা। জংলী রাণীকে স্বাভাবিক মানুষ করা যায় কিনা।

কথাটা হুসনা আলাপের ছলে বললেও বনহুরের মনে সেটা ভীষণ ভাবে দাগ কাটলো। তার মাথায় নতুন এক চিন্তার উদ্ভব হলো। বিছানায় শুয়ে, সমুদ্রের তীরে বসে, জেলেদের সঙ্গে মাছ মারতে গিয়ে সব সময় ঐ চিন্তা তাকে পেয়ে বসলো, যে জংলী রাণী তাকে বিষাক্ত তীর বিদ্ধ করে হত্যা করেছিলো তাকে সে অমানুষ থেকে মানুষ করতে চায়।

বনহুর ধীরে ধীরে তন্ময় হয়ে যায় জংলীরাণীর চিন্তায়। যদিও সে জংলী রাণীকে এখনও দেখেনি তবু সে কল্পনায় একটা অর্দ্ধ উলঙ্গ বলিষ্ঠ তীর ধনু পিঠে বাঁধা নারী মূর্তি মনের পর্দায় এঁকে নেয়।

হুসনা বনহুরকে সব সময় অন্যমনস্ক দেখতে পেয়ে একদিন সে বলেই বসে মিঃ চৌধুরী সব সময় এতো কি ভাবেন বলুন তো?

কিছু না। চলুন সমুদ্র তীরে যাই?

বলুন।

এগিয়ে চলে ওরা পাশাপাশি।

হুসনা বলে আপনি কিন্তু আগের চেয়ে অনেক পালটে গেছেন মিঃ চৌধুরী।

কি রকম?

আগে আপনি যেমন ছিলেন এখন ঠিক তেমনটি নেই।

তার মানে? বনহুর দাঁড়িয়ে পড়ে। তাকায় হুসনার মুখের দিকে।

হুসনাও দাঁড়িয়ে পড়েছিলো—বলে উঠে—আপনি আজকাল সব সময় অন্যমনস্ক থাকেন। জানিনা কি হয়েছে আপনার?

আবার চলতে শুরু করে বনহুর, ঠোঁটে তার মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠেছে—মিস হুসনা যাদের কোনদিন দেশে ফিরে যাবার কোন আশা নেই তাদের চিন্তা ছাড়া কোন গতি আছে নাকি? তাই হয়তো মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি। চলুন সমুদ্রের তীরে গিয়ে বসা যাক।

ওরা দু'জনা এসে বসে পাশাপাশি সমুদ্র সৈকতে।

উচ্ছল ঢেউগুলো এসে আছড়ে পড়ছে ওদের পায়ের কাছে। দূরে কতকগুলো জেলে নৌকা মাছ ধরায় ব্যস্ত।

বলে বনহুর—আজ আবার জংলী রাণী এসে পড়বে কিনা কে জানে।

হুসনা বলে উঠে—সত্যি আমার বড় ভয় করে। মিঃ চৌধুরী ঐ তীরখানা যদি আমাকে বিদ্ধ করতো তবু ভাল হতো......

তার মানে?

মানে আমার জীবনের চেয়ে আপনার জীবনের মূল্য অনেক বেশি তাই।

মিস হুসনা জীবনের মূল্য আপনার আমার কারো কম নয় কিন্তু......যাক ওসব কথা বলুন তো আপনার কি ভাল লাগে আকাশ না সমুদ্র?

যদি বলি—আপনার কি ভাল লাগে?

সমুদ্র।

সমুদ্র? ঐ ভীষণ রাক্ষসী সমুদ্র আপনার ভাল লাগে মিঃ চৌধুরী?

হাঁ। আকাশ নীরব শুধু মানুষের মনে বয়ে আনে সীমাহীন শুন্যতা, আর সমুদ্র ভয়াল ভয়ঙ্কর মানুষকে ভাবিয়ে তোলে—মনকে করে তোলে চঞ্চল উদভ্রান্ত।

আশ্চর্য মানুষ আপনি মিঃ চৌধুরী।

সবাই এ কথা বলে।

আপনি তাহলে শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ পছন্দ করেন না?

কে না চায় শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ—মিস হুসনা, আমিও চাই কিন্তু ভাগ্য আমার বড় অপ্রসন্ন, তাই হয়তো জীবনটা আমার ভয়ঙ্করের দিকেই ধাবিত করে। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে বনহুর—জীবনে একবার নয় বহুবার আমাকে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষতে হয়েছে মিস হুসনা। জানিনা যমদূত কেনো আমাকে বার ঘার মুক্তি দিয়ে গেছে।

মিঃ চৌধুরী আপনার এ সুন্দর জীবনের অন্তরালে তা হলে অনেক কাহিনী জমা হয়ে আছে।

মিস হুসনা আপনার অনুমান মিথ্যা নয়। আমার এই বৈচিত্রময় জীবনের প্রতিটি ধাপে ধাপে জড়িয়ে আছে এক একটা বিস্ময়কর কাহিনী যা মানুযের চিন্তাধারার অতীত।

মিঃ চৌধুরী আপনার জীবনের একটি বিস্ময়কর ঘটনা বলুন না কেনো? অবশ্য যদি আপনার তেমন কোন আপত্তি না থাকে।

না না আপনি আমার জীবনের একটি ঘটনা শুনতে ইচ্ছুক। এটা তো আমার সৌভাগ্য মিস হুসনা।

কি যে বলেন মিঃ চৌধুরী আমি এক নগণ্যা। ......

আবার আপনি সেই নগণ্যায় নেমে গেলেন তাহলে থাক। চলুন ফেরা যাক এবার।

না বলতেই হবে আপনাকে যা বলতে চেয়েছিলেন। বলুন মিঃ চৌধুরী?

আচ্ছা বলছি, বনহুর বলতে শুরু করে—বেশ কয়েক বছর আগে আমি একদিন হিন্দেল রাজ্যে গিয়েছি কোন এক কাজে। হিন্দেল আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন। প্লেন থেকে নেমে বেরিয়ে এলাম এরোড্রামের বাইরে। জায়গাটা সম্পূর্ণ অপরিচিত তাই একটু বিব্রত বোধ করছিলাম। অপেক্ষা করছি গাড়ির জন্য। ঠিক এ মুহূর্তে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো একটা এক্কা গাড়ি। গাড়িখানা দেখে বুঝতে পারলাম কোন রাজা রাজরার গাড়ি হবে। আমি অবাক হয়ে গাড়িখানার দিকে তাকিয়ে আছি এমন সময় দু'জন আরদালী গাড়ির পিছনের পা দানী থেকে নেমে আমাকে কুর্ণিশ জানালো।

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম কারণ এখানে কেউ আমার পরিচিত বা আত্মীয় নেই। আমাকে ওরা কুর্ণিশ জানিয়ে বললো কুমার বাহাদুর মাফ করবেন গাড়ি আনতে একটু দেরী হয়ে গিয়েছে। আসুন......

আমি ঢোক গিলে বললাম—তোমরা ভুল করছো আমি কুমার বাহাদুর নই।

আরদলীদ্বয় কর জোড়ে দাঁড়ালো।

একজন বললো—আপনি রাগ করেছেন কুমার বাহাদুর যদি রাজা বাহাদূর জানতে পারেন তা হলে আমাদের গর্দ্দান যাবে। তা ছাড়া আপনি যদি রাজপ্রাসাদে না যান এ কারণে বৌরাণী নিজে এসেছেন। আপনাকে নিতে।

বিস্ময়ের ওপরে বিস্ময়—বৌরাণী, বৌরাণী এসেছে আমাকে নিতে। মনে মনে আমি আকাশ থেকে পড়লাম। হয়তো আমার মুখে এমন একটা ভাব ফুটে উঠেছিলো যার জন্য এক্কা গাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো ঘোমটা ঢাকা এক নারী মূর্তি।

আমি তখন চোখে সর্ষে ফুল দেখছি।

হুসনা খিল খিল করে হেসে উঠলো, বললো—তারপর?

নারীমূর্তি এসে আমার হাত ধরে বললো—আজও তুমি অভিমান করে রাজপ্রাসাদে যাবে না? জানো মা তোমার জন্য মৃত্যু পথের যাত্রী...

মা, মা মৃত্যুপথের যাত্রী। কথাটা দারুণভাবে আঘাত করলো আমার মনে। আমি কোন আপত্তি না করে নারীমূর্তির সঙ্গে গাড়িতে চেপে বসলাম।

তারপর?

তারপর গাড়ির মধ্যে বসে মাথার ঘোমটা সরিয়ে ফেললো নারীমূর্তি। বিস্ময় শুধু নয় একেবারে হতবাক হয়ে পড়লাম।

কেনো?

অপরূপ এক তরুণী বধু। সমস্ত মুখমন্ডলে অপূর্ব এক স্নিগ্ধতা দু'চোখে অশ্রু নিয়ে তাকালো সে আমার মুখের দিকে।

আমি অবাক চোখে তাকিয়ে আছি।

বধু মানে বৌরাণী হাতের মুঠোয় চেপে ধরলো আমার হাত—বলো ক্ষমা করেছো? বলো—কথা বলছো না কেনো? বুঝেছি ক্ষমা করোনি।

তবু আমি নীরব।

আশ্চর্য মানুষ তো আপনি!

বলুন তখন কি বলবো আমি?

সত্যি আপনি বড় বিপদে পড়ে গেছেন?

হাঁ হুসনা। বৌরাণী গাড়ির মধ্যে আমার পা দু'খানা চেপে ধরে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো—তুমি আমার স্বামী আমাকে যদি ক্ষমা না করো তবে আমি কিঁ নিয়ে বাঁচবো বলো? মৃত্যু ছাড়া আমার কোন পথ নেই আর।

তখনও আপনি নীরব?

কি করবো কোন্ জবাব খুঁজে পাচ্ছিনা। তবু একটু কেশে নিয়ে বললাম—ক্ষমা অনেক আগেই করেছি তোমাকে।

তারপর? তারপর? হুসনা ব্যাকুল আগ্রহে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর বললো—বৌরাণী যেন উচ্ছল আনন্দে আত্ম হারা হয়ে পড়লো, মুখ গুঁজলো আমার বুকে। বুঝতেই পারছেন তখন আর আমি আমিতে নেই। না জানি শেষ পর্যন্ত আমার ভাগ্যে কি আছে কে জানে। হয়তো বা গর্দানটা আমারই যাবে। নিশ্বাস আমার দ্রুত বইতে লাগলো। বুকটা টিপ্ টিপ্ করছে। বৌরাণী বললো—কথা বলছোনা কেনো? আজ তোমাকে পেয়ে আমার যা আনন্দ হচ্ছে কি বলবো। ওগো তুমি এতোদিন কি করে আমাকে ভুলে ছিলে? কি করে ভুলে ছিলো মা বাবাকে...

কি জবাব দেবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। নীরব থাকা ছাড়া কোন উপায় ছিলোনা আমার। গাড়িখানা এক সময় এসে পৌঁছলো হিন্দেল রাজপ্রাসাদের সিংহাদ্বারে।

গাড়ি পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে সিংহদ্বারে সিঙ্গা-ধ্বনি শুরু হয়। প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসে মহারাজ স্বয়ং এবং তার সঙ্গীসাথীগণ। বৌরাণী বলে—চলো, নেমে চলো।

আমি আর বিলম্ব না করে গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম, ভাবলাম যা ভাগ্যে আছে হবে। ভাগ্যের উপর নির্ভর করে বৌরাণীর পিছনে পিছনে মহারাজার সম্মুখে এসে দাঁড়ালাম। ভাবছি এবার নিশ্চয়ই মহারাজ তার সন্তানকে চিনতে পারবেন, মানে আমি যে তার সন্তান নই তা বুঝে নেবেন।

কিন্তু আশ্চর্য মহারাজ আমাকে দেখবা মাত্র বুকে জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বসিত ভাবে কেঁদে উঠলেন—বাবা উদয় তুই ফিরে এলি? তোর মা যে মৃত্যু শয্যায়।

কোন কথা না বলে মহারাজের পায়ের ধূলো গ্রহণ করলাম, কারণ আপাতত আমাকে যুবরাজের অভিনয় করতে হবে তো। না হলে রক্ষে নাই।

সত্যি আপনি দেখছি ভাল অভিনয় করতে পারেন। যেমন জলদস্যু সর্দারের ভূমিকায় নিখুঁত অভিনয় করে জয়লাভ করেছেন।

মিস হুসনা জয়লাভ নয় নিজকে রক্ষার জন্য একটা অভিনব উপায় বলতে পারেন। যাক্ সে কথা, শুনুন। মহারাজ আমাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে গেলেন রাজঅন্তপুরে। দেখলাম সে এক অদ্ভুত রাজ প্রাসাদ। এ যেন হিন্দোল নয় বাংলাদেশের কোন এক মহারাজের বাড়ি। সিংহদ্বারের পরেই একটি মন্দির। মন্দিরে ঘন্টা ধ্বনি হচ্ছে তার সঙ্গে ভেসে আসছে পুরোহিতের মন্ত্রপাঠের আওয়াজ। সমস্ত প্রাসাদে সে ঘন্টা ধ্বনি অপূর্ব একভাবের আবেশ ছড়িয়ে দিচ্ছে। আমি হতবাকের মত এগুচ্ছি।

প্রাসাদের সবাই আমাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। আমার কেমন যেন লাগছিলো, ভয়ও হচ্ছিলো মনে মনে হঠাৎ যদি কেউ বলে বসে, এ রাজকুমার নয় অপরিচিত এক ব্যক্তি তা হলেই হয়েছে। মহারাজ আমাকে নিয়ে প্রবেশ করলো এক কক্ষে।

সে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করে আমি স্তম্ভীত হয়ে গেলাম। দেখলাম একটি দুগ্ধ ফেনিল শুভ্র শয্যায় শায়ীত এক শুভ্রকেশী বৃদ্ধা। বুঝতে পারলাম মহারাণী মানে রাজকুমারের জননী।

মহারাজ আমাকে নিয়ে এলেন তার পাশে আনন্দ ভরা কণ্ঠে বললেন—তোমার সন্তান এসেছে কিঙ্করী দেবী।

কে উদয়। বাবা উদয় এসেছে? আমার উদয় এসেছে...বলে বৃদ্ধা শয্যায় উঠে বসলেন।

মহারাজ বললেন—যাও উদয় জননীর কাছে যাও। তোমার জন্য কেঁদে কেঁদে তার দু'চোখ অন্ধ হয়ে গেছে।

আমি যন্ত্রচালিতের মত এগিয়ে গেলাম বৃদ্ধার পাশে। বৃদ্ধা আমাকে আঁকড়ে ধরলেন বুকে মাথায় পিছে হাত বুলিয়ে আমার দেহ স্পর্শ করে বৃদ্ধা

অকস্মাৎ বলে উঠলো—না না এ তোমরা কাকে এনে দিয়েছো আমার কাছে। এ আমার উদয় নয়—এ আমার উদয় নয়...

হুসনা বলে উঠে—আশ্চর্য এতোক্ষণ যারা আপনাকে দেখলেন কেউ ধরতে পারলোনা আর অন্ধ হয়েও জননী তার সন্তানকে চিনতে ভুল করলোনা?

সত্যি আশ্চর্যই বটে।

তারপর?

তারপর আমার অবস্থা বুঝতেই পারছেন। অবশ্য মহারাজ বলে উঠেন—এ তুমি কি বলছো রাণী। রাজকুমার উদয় ফিরে এসেছে তাকি তুমি বিশ্বাস করছোনা।

না, এ আমার উদয় নয়। রাণীর গলায় কঠিন ভাব।

বললো মহারাজ—তুমি ভুল করছো রাণী এই তোমার উদয়, তোমার সন্তান......

না না এ কখনও হতে পারে না। তোমরা ভাল করে তাকিয়ে দেখো এ আমার উদয় কিনা।

রাণীর কথায় মহারাজ এবং তার দলবল সবাই আমার দিকে তীক্ষ্ণ নজরে তাকালো। আমার অবস্থা তখন কল্পনাতীত। আমি ভয়ে বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছি।

মহারাজ হঠাৎ বলে উঠলেন—বলো কে তুমি? এতো আমাদের উদয় নয়।

সবাই এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ী করলো।

অদূরে দাঁড়িয়ে বৌরাণী এতোক্ষণ তাকিয়ে ছিলো আমার দিকে। দু'চোখে তার আনন্দ উচ্ছ্বাস, কখন যে আসবে পাশে তার জন্য প্রতিক্ষা করছে সে বিপুল আগ্রহ নিয়ে কিন্তু মুখখানা তার অন্ধকার হয়ে গেলো মুহূর্তে। একটা বিস্ময় কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাব ফুটে উঠলো তার মুখে।

আমার দিকে তাকিয়ে আছে বৌ-রাণী করুণ অসহায় চোখে। আমি তখন কি করবো ভেবে পাচ্ছিনা, সীতাদেবীর মত মনে মনে স্মরণ করছি, হে মা ধরিত্রী তুমি দ্বি-খণ্ড হও তোমার মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে ফেলি....

কিন্তু মা ধরিত্রী দ্বি-খণ্ডিত হলোনা, মহারাজের বজ্র কঠিন কণ্ঠ আমাকেই দ্বি-খণ্ড করার নির্দেশ দিলেন, বললেন তিনি নিয়ে যাও জল্লাদ এর গর্দ্দান ছেদন করো।

সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ওরা ধরে নিয়ে চললো, হাতে বেড়ী, কোমরে দড়ি, মজবুত করে বেঁধে একেবারে বধ্যভূমিতে......

হুসনা অস্ফুট কণ্ঠে বললো—এতো নির্দয় সেই মহারাজ?

হাঁ ওরা আমাকে কোন দয়া না দেখিয়ে সোজা বধ্যভূমিতে এনে দাঁড় করালো।

চারিদিকে অসংখ্য জনতা ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে। সকলের চোখে মুখে একটা বিরাট উত্তেজনার ছাপ আমি দেখতে পাচ্ছি। তারা সবাই করুণার চোখে তাকিয়ে আছে আমার মুখে।

পাশে দু'জন দারওয়ান—কঠিন হাতে এঁটে ধরে আছে।

ঢোক গিলে বলে হুসনা তারপর!

আমাকে ওরা উবু করে ধরলো। জল্লাদ খর্গ উচিয়ে ধরেছে, আমি দু'চোখ বন্ধ করে ফেললাম। একটা শব্দ আমার কানে এলো...খ-চ ......তারপর আমার মাথাটা গড়িয়ে পড়লো বধ্যভূমিতে।

হুসনা আর্তনাদ করে উঠলো—উঃ কি সর্বনাশ। —তারপর।

—সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘুম ভেংগে গেলো।

দু'চোখ কপালে তুলে বললো হুসনা—আপনি তা হলে স্বপ্ন দেখছিলেন।

বুঝতেই পারছেন যদি ব্যাপারটা স্বপ্ন না হতো তা হলে আজ এমন করে আপনার পাশে বসে গল্প করতে পারতামনা।

খিল খিল করে হেসে উঠে হুসনা, বলে সে—সত্যি আপনি বড্ড চালাক মানুষ। এমন ভাবে গুছিয়ে বললেন যেন একেবারে সত্যি।

যাক সময় কাটলো তো এবার উঠে পড়ুন ফেরা যাক। বনহুর আর হুসনা ফিরে চললো তাদের কুঠিতে।

বনহুর এমনি ভাবে নানা কথাবার্তা আর গল্পের মধ্যে দিয়ে সময় গুলো অতিবাহিত করে চলে। আজকাল মাছ ধরা বনহুরের নেশা হয়ে গেছে। প্রতিদিন সে মাছ মারতে যায়। হুসনাও যায় তার সঙ্গে, তবে প্রতিদিন নয় মাঝে মাঝে।

তবে সেদিন জেলে বাবার মুখে জংলী মেয়ে সম্বন্ধে শোনার পর থেকে বনহুরের মনে যে একটা চিন্তার ছাপ পড়েছে সেটা মিথ্যা নয়।

কিন্তু কি ভাবে সে?

❑

সকলের অলক্ষে বনহুর একদিন কুন্দল দ্বীপের যে অঞ্চলে গভীর জঙ্গল আছে সেই দিকে রওয়ানা দিলো। সমুদ্র ছেড়ে বহুদূরে এ জঙ্গল। জেলেরা ভুলক্রমেও কোনদিন এসব দিকে পা বাড়ায় না। জানে তারা এই জঙ্গলে যে সব জংলী বাস করে তারা কত ভয়ঙ্কর। যদি কাউকে ওরা এ জঙ্গলে দেখে, তাকে ওরা জীবন নিয়ে ফিরতে দেয় না।

এই ভয়ঙ্কর জঙ্গল অভিমুখে এগিয়ে চলেছে বনহুর। নানা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার সঙ্গের অস্ত্রগুলো আজ তার সঙ্গে নাই। জেলে বাবার দেওয়া একটা বর্শা হাতে নিয়ে বনহুর চলেছে।

অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে আত্মগোপন করে এগিয়ে যাচ্ছে বনহুর। এ জঙ্গলে ভয়ঙ্কর জীবজন্তুর আতঙ্কের চেয়ে আতঙ্ক বেশি জংলীদের। জংলীরা সদা সর্বদা এ জঙ্গলে বিচরণ করে ফিরছে।

মাঝে মাঝে জংলীদের সম্মুখে পড়ে যায় বনহুর কিন্তু অতি সাবধানে সামলে নিয়ে আত্মগোপন করে চলে। বহু কষ্টে এক সময় জঙ্গলটার প্রায় মাঝা-মাঝি এসে পৌঁছে সে।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে অমনি একটা শব্দ তার কানে আসে। বনহুর থমকে দাঁড়িয়ে তাকায় সম্মুখের দিকে। এদিকে জঙ্গলটা কিছু হালকা বলে মনে হচ্ছে। হঠাৎ বনহুরের দৃষ্টি চলে যায় সম্মুখে একটা ঝোপের ফাঁক দিয়ে দূরে। ঝোপটার ওপাশে একটা জলাশয় বা হ্রদে সাঁতার কাটছে একটি মেয়ে।

মুহূর্ত বিলম্ব না করে বনহুর ঝোপের মধ্যে আত্মগোপন করে দেখতে লাগলো। কে এই তরুণী নিশ্চয়ই জংলী কোন মেয়ে। কিন্তু জংলী মেয়েরা তো কুৎসিত কদাকার হয়, বনহুর বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে দেখতে থাকে যে

তরুণী জলাশয়ে সাঁতার কাটছে সে কুৎসিত বা কদাকার নয়। যদিও তরুণীটির গলা অবধি জলমগ্ন তবু অনুমানে বোঝা যায় তরুণী সুন্দরী বটে। একরাশ ঘন চুল মাথায়। সূর্যের স্বল্প আলোতে তরুণীর শুভ্র দেহটা সচ্ছ জলধারার ফিকে গোলাপী মনে হচ্ছিলো। বনহুর ঝোপের মধ্যে আত্মগোপন করে আরও সরে আসে জলাশয়ের ধারে।

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মেয়েটিকে।

স্বচ্ছ জলধারায় মেয়েটির যৌবন দীপ্ত সুডৌল দেহের কিছু অংশ নজরে পড়লো। বনহুর বিস্ময় নিয়ে লক্ষ্য করলো, নিশ্চয়ই এই তরুণী জংলী রাণী হবে। হঠাৎ তার চোখে ধরা পড়লো জলাশয়ের ধারে একটি তীর ধনু পড়ে আছে।

বনহুরের চোখ দু'টো চক্ চক্ করে উঠলো। বুঝতে পারলো জংলী রাণী তীর ধনু রেখে স্নানে নেমেছে। অত্যন্ত গরম সে কারণেই জংলী রাণী বেছে নিয়েছে এই ঠান্ডা জলাশয়। বনহুর ঝোপের ভিতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে। যেন কোন ক্রমে জংলী রাণী তাকে দেখে না ফেলে এজন্য সতর্কভাবে এগিয়ে চলে যেখানে তীর ধনুখানা পড়ে আছে সেই জায়গায়। বনহুর তীর ধনু খানা তুলে নেয় হাতে। তারপর সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায়, তাকিয়ে দেখে আশে পাশে কেউ কোথাও নাই। জংলী রাণী তখন মনের আনন্দে এদিক ওদিক সাঁতার কাটছে।

বনহুর তীর ধনু ছুঁড়ে ফেলে দেয় জলাশয়ের গভীর পানিতে তারপর মুখের মধ্যে দুটি আংগুল রেখে শিষ দেয় খুব জোরে।

সঙ্গে সঙ্গে ফিরে তাকায় জংলী রাণী।

যদিও সেই অথৈ পানিতে ছিলো তবু তার চোখ দুটো কাল নাগিনীর মত জ্বলে উঠলো, দ্রুত সাঁতার কেটে উঠে এলো তীরে। যেখানে তীর ধনু ছিলো সেখানে ছুটে গেলো কিন্তু তীর ধনু সে খুজে না পেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। বিষধর সাপের মত ফোঁস ফোঁস করছে জংলী রাণী।

বনহুর তীক্ষ্ণ নজরে তাকালো। অর্দ্ধ উলঙ্গ জংলী রাণীর যৌবন দীপ্ত চেহারা তাকে অভিভূত করলো যেন। কিছুক্ষণ সে মন্ত্র মুগ্ধের মত তাকিয়ে রইলো তারপর ধীর পদক্ষেপে এগুতে লাগলো সে।

জংলী রাণী যেন পালাতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে এগুচ্ছে বনহুর।

যেই মাত্র বনহুর নিকটে পৌঁছেছে অমনি জংলী রাণী ঝাঁপিয়ে পড়তে গেলো হ্রদের জলে। বনহুর অমনি দ্রুত ধরে ফেললো ওকে।

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করতে গেলো জংলী রাণী কিন্তু বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে ওর মুখে হাত চাপা দিলো। এতো জোরে এঁটে ধরলো ওর মুখ যেন জংলী রাণীর কণ্ঠে এতোটুকু শব্দ বের হতে না পারে।

জংলী রাণী বনহুরের বাহুর আবেষ্টনী থেকে নিজকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য ভীষণ ধস্তা-ধস্তি শুরু করে দিলো। যত শক্তিশালী নারীই হোক পুরুষের শক্তির কাছে নারী সব সময় দুর্বল এ কথা সত্য। তবু বনহুরের মত শক্তিশালী পুরুষের সঙ্গে পেরে উঠা কিছুতেই সম্ভব নয়।

জংলী রাণী কোন ক্রমে ছাড়া পেলেই সে চিৎকার করে উঠবে। তারপর সঙ্গে সঙ্গে জংলীরা ছুটে এসে ঘিরে ধরবে, হত্যা করবে তাকে নির্মমভাবে। কাজেই বনহুর জংলী রাণীর মুখে কৌশলে একটি রুমাল ধরনের কাপড় বেঁধে দেয় ক্ষিপ্র হাতে। তারপর তুলে নেয় কাঁধে।

জংলী রাণী হাত পা ছুঁড়তে থাকে।

বনহুর ওকে নিয়ে চলে আসে জলাশয়ের অদূরে একটা বৃহৎ আকার গাছের আড়ালে। জংলী রাণীকে নামিয়ে দিয়ে হাত দু'খানা বলিষ্ঠ হাতে চেপে ধরে।

জংলী রাণী বন্দী সিংহীর মত ছটফট করতে লাগলো। কতকগুলো লতা গাছে ঝুলছিলো সেই বৃহৎ আকার বৃক্ষটার সঙ্গে। বনহুর একটি লতা গাছ কেটে নিলো দাঁত দিয়ে, তারপর জংলী রাণীর হাত দু'খানা পিছমোড়া করে বেঁধে ফেললো মজবুত করে।

এবার বনহুর জংলী রাণীর হাত এবং মুখ বাঁধা অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ালো। জংলী রাণী ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে বনহুরের দিকে।

বনহুর জংলী রাণীকে বয়ে আনতে গিয়ে হাঁপিয়ে না উঠলেও ঘেমে উঠেছিলো। হাতের পিঠে কপালের ঘাম মুছে গাছের গুড়িটার উপর বসে পড়লো।

জংলী রাণী ক্রোধে একেবারে ফেটে পড়লো যেন। সে হাতের বাঁধন এবং মুখের বাধন খোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো।

কেটে গেলো কয়েক মিনিট।

বনহুর এবার উঠে এলো, ওর হাতের বাঁধন মুক্ত করে দিয়ে মুখের বাধন এবার মুক্ত করে দিলো।

জংলী রাণী বনহুরকে ধরে কিল চড় ঘুষি লাগাতে শুরু করলো। বনহুর নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর হেসে উঠলো অট্টহাসি।

জংলী রাণী বুঝতে পারলো তার কিল চড় ঘুষি ওর শরীরে কোন আঘাত করতে পারেনি বা কষ্ট জাগাতে সক্ষম হয়নি। বনহুর যখন হাসছিলো তখন জংলী রাণী দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো ওর দিকে।

বনহুর হাসি থামাতেই জংলী রাণী দিলো ছুট। গভীর জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেলো সে।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে ছুটতে শুরু করলো। কারণ জংলী রাণী তার আস্তানায় পৌঁছেই সংবাদ দিবে তার জংলী বাবা মা এবং সাঙ্গ-পাঙ্গকে। তারা এখানে পৌঁছবার পূর্বেই বনহুর জঙ্গল অতিক্রম করে বেরিয়ে যেতে চায় বাইরে। অবশ্য জংলীদের সে ভয় করে না; কিন্তু ইচ্ছা নেই ওদের ঘাটাতে।

❑

সন্ধ্যা পেরিয়ে গেলো তবু বনহুর ফিরে এলো না। হুসনা এবং জেলে বাবা ও অন্যান্য জেলে দল সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। সে গেলো কোথায়, জেলে বাবা দলবল নিয়ে মশাল হাতে সন্ধানে বের হলো ওরা।

হুসনা তার দড়ির খাটিয়ায় বসে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। এই অজানা অচেনা দ্বীপে সেই যে ছিলো তার একমাত্র

সহায়। এখন কি নিয়ে বাঁচবে সে......যতই ওর কথা মনে হচ্ছে ততই বেশি করে কাঁদতে শুরু করলো হুসনা।

ওদিকে সমুদ্র তীরে তন্ন তন্ন করে খুঁজে ফিরতে লাগলো জেলে বাবা বনহুরকে।

জেলে পাড়ার সবার মুখে উদ্বিগ্নতার ছাপ ফুটে উঠেছে। জেলে বাবা এবং নারী পুরুষ সবাই ভালবাসতো বনহুরকে, তাই সবাই চিন্তিত হয়ে পড়েছে ভীষণভাবে!

চুমকী এসে প্রবোধ দিতে লাগলো হুসনাকে। তবু হুসনা কিছুতেই মনকে স্থির করতে পারে না। সে উন্মাদিনীর মত বিছানায় লুটিয়ে কাঁদতে লাগলো।

জেলে বাবা দলবল নিয়ে ফিরে এলো এক সময়। হুসনা ছুটে বেরিয়ে এলো, জেলে বাবার হাত দু'খানা ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে ব্যাকুল কণ্ঠে বললো—বাবা বলো মিঃ চৌধুরী কোথায়?

জেলে বাবা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো—তাকে পাওয়া গেলো না মা। কোথাও তাকে পেলাম না।

হুসনা উচ্ছ্বসিতভাবে কেঁদে উঠলো—বাবা এখন আমার কি উপায় হবে?

কেনো মা আমি আছি......বাবু যদি ফিরে না আসে তোর দুঃখ হবে না মা।

হুসনা জেলে বাবার কথায় সান্তনা খুঁজে পায় না। সে চলে যায় কুঠিরের মধ্যে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে বনহুর এসে পড়ে।

জেলে বাবার দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করে বনহুর। ওকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ ধ্বনি করে উঠে—বাবু বাবু তুই এসেছিস? ছুটে গিয়ে জাড়িয়ে ধরে জেলে বাবা বনহুরকে।

অন্যান্য জেলেরা সবাই ঘিরে ধরে, সবার চোখে মুখে আনন্দোচ্ছ্বাস।

চুমকী গিয়ে বলে—বৌ-রাণী বৌ-রাণী বাবু এসে গেছে......

সত্যি! অস্ফুট কণ্ঠে কথাটা উচ্চারণ করে উঠে দাঁড়ায় হুসনা তারপর দ্রুত বেরিয়ে আসে। দেখতে পায় সবাই ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে বনহুরকে। হুসনা ভুলে যায় চারিদিকের লোকজন, ছুটে এসে বনহুরের বুকে মুখ গুঁজে বলে—মিঃ চৌধুরী আপনি কোথায় গিয়েছিলেন? বলুন আপনি আমাকে একা ফেলে কোথায় গিয়েছিলেন?

বনহুর বললো—জঙ্গল দেখতে গিয়েছিলাম।

জেলে বাবা বলে উঠে—জঙ্গল? বাবু তুই জঙ্গল দেখতে গিয়েছিলি?

হাঁ বাবা।

এমন সর্বনাশ তুই কেনো করলি? জানিস বাবু জংলীরা যদি তোকে দেখতো খুন করে ফেলতো।

সকলের মুখেই একটা ভীত আতঙ্কিত ভাব ফুটে উঠলো।

হেসে বললো বনহুর—জংলীদের দেখতেই গিয়েছিলাম বাবা কিন্তু দেখা হলোনা।

বাবু আর কোনদিন এমন কাজ করবিনা। আর যাবি না বাবু তুই।

আচ্ছা। এখন তোমরা যাও জেলে বাবা। এই—তো ফিরে এসেছি আর ভয়ের কোন কারণ নাই। কথাগুলো বলে সবাইকে যার যার ঘর অভিমুখে পাঠিয়ে ফিরে তাকায় হুসনার দিকে, বলে—চলুন।

হুসনা এবং বনহুর ফিরে আসে কুঠিরের মধ্যে।

দড়ির খাটিয়ায় বসে বলে বনহুর—মিস হুসনা আপনি খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলেন—বুঝি?

অশ্রু ছল ছল চোখ দুটো তুলে ধরে হুসনা বনহুরের মুখে, বলে—এই অজানা অচেনা দ্বীপে আপনি যে আমার একমাত্র সহায়। আপনি যদি এমনি করে চলে যান তা হলে আমি বাঁচবো না।

মিস হুসনা আপনি বড্ড ছেলে মানুষ না হলে এমন করে কাঁদে। চুমকীর কাছে আমি সব শুনেছি। কিন্তু এ আপনার অন্যায়।

এমন সময় চুমকী আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে, বলে—বাবু তুই চলে গেছিস পর্যন্ত বৌরাণী কিছু মুখে দেয়নি।

বনহুর তাকালো হুসনার দিকে চোখে মুখে তার প্রশ্ন ভরা চাহনী।

চুমকী বললো—বাবু ঐ যে ওখানে তোদের খাবার ঢাকা দেওয়া আছে তোরা খেয়ে নে। বাবু বৌ-রাণীকে খাইয়ে দিস।

কথাগুলো বলে চলে গেলো চুমকী।

বনহুর এবার বললো—মিস হুসনা আপনি শুধু ভুলই করেননি অন্যায় করেছেন। কারণ যদি আমি আর নাইবা ফিরতাম। যদি জংলীদের কবলে পড়ে প্রাণ হারাতাম তাহলে আপনি এমনিভাবে না খেয়ে নিজকে নিঃশেষ করে ফেলতেন। বলুন—বলুন মিস হুসনা আপনি আর এমন কাজ করবেন না?

হুসনা কোন জবাব দিলোনা।

বনহুর খাবার থালা দু'খানা দু'হাতে তুলে নিয়ে এলো, একটি হুসনার সম্মুখে রেখে বললো—নিন, খেয়ে নিন মিস হুসনা।

এবার হুসনা কথা বললো—বলুন এমনি করে আর চলে যাবেন না?

হেসে বললো বনহুর—মিস হুসনা আপনি যা ভয় করছেন তা আমি নিজেও জানি। জঙ্গলে বড় ভয় বড় বিপদ কিন্তু না গেলেই নয়।

মিঃ চৌধুরী আপনাকে আমি কিছুতেই যেতে দেবোনা।

বিশেষ কোন প্রয়োজনে যেতে হবে আমাকে...

প্রয়োজন! ঐ ভয়ঙ্কর জঙ্গলে আপনার কি প্রয়োজন মিঃ চৌধুরী?

আজ নয় বলবো একদিন।

যদি আজ বলেন তাহলে কোন ক্ষতি হবে কি?

হয়তো আপনি যেতে দিতে চাইবেন না। তার চেয়ে পরে সব বলবো আপনাকে। নিন এবার খান দেখি। বনহুর নিজের হাতে খাবার তুলে হুসনার মুখে দেয়।

হুসনা না খেয়ে পারে না।

খেতে খেতে বলে বনহুর—সত্যি অপূর্ব।

কি মিঃ চৌধুরী?

জঙ্গলটা।

জঙ্গল আবার অপূর্ব হয় নাকি?

হয়না কে বললো। যেমন সমুদ্র সুন্দর, যেমন আকাশ সুন্দর, তেমনি সুন্দর জঙ্গল...

মিঃ চৌধুরী আপনি সুন্দর তাই আপনার চোখে সবই সুন্দর।

হুসনার কথায় হাসে বনহুর।

সেদিন রাতে বেশি আর কোন কথা হয়না বনহুর আর হুসনার মধ্যে।

বনহুর অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করছিলো তাই সে শয্যা গ্রহণ করলো। কিন্তু ঘুম তার চোখে এলোনা। জংলী রাণীর কথা তার মনে তোল পাড় করে চললো।

পাশের খাটিয়ায় হুসনা এপাশ ওপাশ করছে। মাঝে মাঝে নিজের অলক্ষে চোখ দু'টো চলে যাচ্ছে বনহুরের দিকে।

বনহুর যে ঘুমায়নি বুঝতে পারে হুসনা। সে কিছুক্ষণ নীরব থেকে লক্ষ্য করে তারপর বলে মিঃ চৌধুরী।

বনহুর জবাব দেয়, বলুন?

এখনও ঘুমান নি?

উঁ হুঁ। ঘুম পাচ্ছে না।

কিন্তু কেনো ঘুম পাচ্ছেনা এ কথাটা হুসনা তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেনা। কেমন যেন একটা সংকোচ দ্বিধা তার কণ্ঠকে রোধ করে দেয়।

বেশ কিছুক্ষণ নীরবে কাটার পর বলে উঠে বনহুর মিস হুসনা আপনি মিছামিছি আমার জন্য ভাবেন। যদি নাই ফিরে আসতাম তাই বলে আপনি এইভাবে না খেয়ে নিজকে নিঃশেষ করে ফেলতেন।

হুসনা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে আপনি পুরুষ মানুষ তাই বুঝবেন না অন্তরের ব্যথা। কথাটা বলে হুসনা বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে।

বনহুর ভাবতে পারেনি হুসনা এভাবে কেঁদে উঠবে, কাঁদলে ধৈর্যচ্যুতি ঘটে বনহুরের। সে খাটিয়ায় উঠে বসে বলে—মিস হুসনা আপনার ব্যথা বুঝি। বুঝি আপনি মা বাবার কাছে ফিরে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন কিন্তু আমি তো চেষ্টার কোন ত্রুটি করিনি। সকালে বিকালে এবং মাছ ধরার

কালে সর্বক্ষণ আমার একটা দৃষ্টি সন্ধান করে ফেরে এ পথে কোন জাহাজ আসে কিনা। মিস হুসনা আমার কি ভাল লাগছে এ বন্দী জীবন? দিন দিন আমি হাঁপিয়ে উঠছি। ক্রমেই একটা নিরাশার অন্ধকারে যেন তলিয়ে যাচ্ছি...

হুসনা চোখ তুলে তাকালো বনহুরের দিকে। আসলে তার এ জীবন মোটেই অসহ্য লাগছিলোনা। কারণ হুসনা সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে ভালবেসে ফেলেছিলো মিঃ চৌধুরীকে। যতক্ষণ মিঃ চৌধুরী তার পাশে থাকে ততক্ষণ তার মনে কোন রকম ব্যথা বেদনা স্থান পায়না যখন সে তার কাছ থেকে দূরে সরে যায় তখন সে নিজকে কিছুতেই স্থির রাখতে পারেনা, একটা শূন্যতা তার মনে যেন আগুন ধরিয়ে দেয়। অসহ্য লাগে সেই মুহূর্তগুলো ওর কাছে। সে কারণেই হুসনা এতো বেশি উত্তলা হয়ে পড়ে তার জন্য।

হুসনা ব্যক্ত করতে পারেনা তার মনের নিভৃতের গোপন কথাগুলো মিঃ চৌধুরীর কাছে। অবশ্য ইচ্ছা যে নেই তা নয়, একটা বাধা তাকে সংযত করে রাখে। যেখানে মিঃ চৌধুরীর মধ্যে সে কোনো সময় লক্ষ্য করেনি এতোটুকু অসংযত ভাব।

হুসনা কোন জবাব দেয়না, সে নীরবে চোখ দুটো বন্ধ করে শুয়ে থাকে।

এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে হুসনা।

বনহুর ভেবে চলে জংলী রাণী মানুষ হয়েও সে আজ মানুষ নয়। জেলে বাবার কোন সন্তান নেই তার অন্তরের সে ব্যথা বোঝে বনহুর। জেলে বাবা একটি সন্তান চেয়েছিলো পায়নি। জংলীরাণীর জীবন কাহিনী বলতে গিয়ে সেদিন বৃদ্ধ কেঁদে ফেলেছিলো প্রায়। বনহুর ভাবে সে যদি জংলী রাণীকে মানুষ করে তুলতে পারে তাহলে হয়তো জেলে বাবার হাতে ওকে তুলে দিয়ে কিছুটা ঋণ পরিশোধ করতে পারবে। কারণ জেলে বাবা তাকে একবার নয় দু'বার মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছে। বৃদ্ধার এ ঋণ সে কিছুতেই পরিশোধ করতে পারবেনা যতক্ষণ না সে জংলী রাণীকে এনে দিতে না পেরেছে।

বনহুর সেই রাতে মনস্থির করে ফেলে জংলীরাণীকে যেমন করে হোক সভ্য মানুষে পরিণত করবে। হয়তো এ ব্যাপারে তাকে বহু বিপদের সম্মুখীন হতে হবে তবু সে পিছপা হবেনা। জংলী রাণীর কথা স্মরণ হতেই মনের পর্দায় ভেসে উঠে নূরীর মুখখানা।

জংলীরাণীর মতই ছিলো নূরী শিশুকাল থেকে সেও জঙ্গলে মানুষ হয়েছে। হিংস্র জীবজন্তু আর জঙ্গলের পশু পাখি ছিলো তার সাথী। সভ্য সমাজের কিছু বুঝতোনা নূরী। পাহাড়ে পর্বতে নদী-নালা আর ঝরণায় চঞ্চল হরিণীর মতই সে ঘুরে বেড়াতো উচ্ছল গতিতে। সেই নূরীর মধ্যেও একদিন এসেছিলো যৌবনের উন্মাদনা। প্রেম আর ভালবাসার জন্য সেও একদিন উন্মাদিনী হয়ে উঠেছিলো। তেমনি জংলীরাণীও মানুষ তার মধ্যেও আছে একটি নারী হৃদয়, যে হৃদয়ে লুকানো আছে প্রেম-প্রীতি স্নেহ মায়া-মমতা। যেমন করে হোক জংলীরাণীর হৃদয়ে এ সবের অনুভূতি সৃষ্টি করতে হবে, তাহলেই সে সভ্য সমাজে স্থান পাবে—

পরদিন সবার অলক্ষ্যে বনহুর আবার সেই জঙ্গলে গিয়ে হাজির হলো। সতর্কতার সঙ্গে সে এসে পৌঁছলো ঐ হ্রদের পাশে। ঝোপের মধ্যে আত্মগোপন করে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। কিন্তু কোথায় জংলীরাণী, শূন্য হ্রদের বুকটা যেন খাঁ খাঁ করছে।

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর বনহুর জংলীরাণীর সন্ধানে গভীর জঙ্গল অভিমুখে রওয়ানা দেবার জন্য যেমন ঝোপ থেকে বেরুতে যাবে অমনি হ্রদের ধারে নজর গিয়ে পড়লো। একটা উচুঁ পাথর খন্ডের পাশে দাঁড়িয়ে আছে জংলীরাণী। পিঠে তার তীর ধনু বাঁধা, চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে কি যেন দেখছে।

বনহুর তীক্ষ্ন দৃষ্টি লক্ষ্য করলো জংলীরাণীর চোখে আজ সন্ধানী দৃষ্টি, পরনে হরিণের চামড়া, বুকটা সম্পূর্ণ খোলা। লম্বা লম্বা চুলগুলো ছড়িয়ে আছে কাঁধে বুকে পিঠে।

শুভ্র শুভ্র দেহটার কিছু কিছু অংশ কটা চুলের ফাঁকে মেঘের আড়ালে চাঁদের মতই সুন্দর মনে হচ্ছিলো। জংলীরাণী কিছুক্ষণ এদিক ওদিক তাকিয়ে কোন কিছুর সন্ধান করলো তারপর ফিরে চললো মন্থর গতিতে।

যে ঝোপটার মধ্যে বনহুর আত্মগোপন করেছিলো ঠিক সেই ঝোপটার পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলো জংলীরাণী।

বনহুর লক্ষ্য করছিলো, যেমন জংলীরাণী তার সামনা সামনি এসে পড়েছে অমনি বনহুর একলাফে জংলীরাণীর পিছন থেকে তাকে ধরে ফেলে। তারপর ওর পিঠে বাঁধা তীর ধনু খোলে নেয় বলিষ্ঠ হাতে।

জংলীরাণী কিছুতেই তার ধনু বনহুরকে দেবেনা, সে এটে ধরে কিন্তু পারেনা। বনহুর তীর ধনূটা নিয়ে ছুড়ে ফেলে দেয় হ্রদের পানিতে।

বনহুর এরপর মুক্ত করে দেয় ওকে!

জংলীরাণীর মুখ আজ খোলা থাকলেও সে চিৎকার করে না বা ছুটে পালিয়ে যায় না।

বনহুর জংলীরাণীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকে ওর চোখের দিকে।

জংলীরাণীও তাকিয়ে আছে, সে বিস্ময় ভরা চোখে বনহুরকে দেখছে। সে জংলীদের মধ্যে বড় হয়েছে, সভ্য মানুষ সে দেখেনি কোন দিন। জেলেদের সঙ্গে মাঝে মাঝে লড়াই হয়েছে কিন্তু জেলেরা এমন চেহারার নয়।

জংলীরাণী যখন বনহুরের পা থেকে মাথা অবধি লক্ষ্য করে দেখছে তখন বনহুর দু'পা সরে আসে।

যেমন সে দু'পা সরে এসেছে অমনি জংলীরাণী হ্রদের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারপর সে দ্রুত সাঁতার কেঁটে পালিয়ে গেলো বনহুরের দৃষ্টির আড়ালে।

বনহুর ফিরে এলো আজ।

সন্ধ্যার পূর্বেই বনহুর ফিরে এসেছে, তাই কেউ তেমন চিন্তিত হয়নি। যদিও কেউ চিন্তিত হয়নি তবু হুসনার মনে একটা চিন্তার ছায়া ঘনিভূত হয়ে আসছিলো। কারণ মিঃ চৌধুরী আজও মাছ ধরতে যায় নি তবে গেলো কোথায়!

হুসনা জেলে বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলো—বাবা আজ মিঃ চৌধুরী তোমাদের সঙ্গে মাছ ধরতে যায়নি।

জেলে বাবা বলেছিলো—না তো, বাবু আজও মাছ ধরতে যায়নি।

হুসনা আপন মনেই বলেছিলো—তবে তিনি আজও জঙ্গলে গেছে? কিন্তু কে দেবে তার জবাব কারণ জেলে বাবা বা অন্য কেউ জানেনা কোথায় গেছেন মিঃ চৌধুরী!

সন্ধ্যায় যখন ফিরে এলো বনহুর তখন হুসনা অভিমান ভরা কণ্ঠে বললো—আজও বুঝি জঙ্গলে গিয়েছিলেন?

হেসে বলে বনহুর—হাঁ মিস হুসনা।

গলার-স্বরে অভিমান জড়িয়ে বলে হুসনা—জঙ্গলে কি আছে আপনার, জঙ্গলে কেনো যান বলুন তো?

জঙ্গল আমার কাছে বেশ লাগে তাই।

মিথ্যে কথা।

উ হুঁ, মোটেই মিথ্যে নয় মিস হুসনা।

জঙ্গল কারো ভালো লাগে নাকি? সে এক ভীষণ আর ভয়ঙ্কর স্থান। চারিদিকে শুধু হিংস্র জীব আর সাপ।

যদি বলি এসব দেখতে...মানে আমি ভয়ঙ্কর কে উপলব্ধি করতে যাই।

অদ্ভুত মানুষ আপনি মিঃ চৌধুরী।

একথা সবাই বলে আপনিও বলছেন মিথ্যে নয় জানি।

নিন, খেয়ে নিন, কাল থেকে জেলে বাবাকে বলে আপনার জন্য কড়া পাহারার ব্যবস্থা করবো।

হেসে উঠলো বনহুর হাঃ হাঃ করে।

বনহুরের হাসি থামলে বললো হুসনা—এমন হাসতে জানেন যা জীবনে দেখিনি।

তাই নাকি মিস হুসনা?

হ্যাঁ।

যাক কাল থেকে যখন আমার উপর কড়া পাহারা চলবে তখন আজ একটু ভালভাবে এদিক ওদিক বেরিয়ে নিই। চলুন সমুদ্র তীরে গিয়ে বসি?

চলুন।

বনহুর আর হুসনা সমুদ্র তীরে গিয়ে বসে।

নানা গল্পস্বল্প করে বনহুর হুসনার সঙ্গে। বনহুর জানে হুসনা এখানে সম্পূর্ণ সঙ্গী সাথী হীন। তাকেই হুসনা একমাত্র ভরসা মনে করে। বনহুর চায়না হুসনার মনে সে আঘাত দেয়। যতদূর বা যতটুকু সম্ভব হুসনাকে সে খুশি রাখার চেষ্টা করে। তাছাড়া হুসনা বাঁচবে কি করে সেও তো মানুষ।

হুসনাকে খুশি করার জন্য বনহুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক কিছু করে বসে, কিন্তু সীমার বাইরে নয়। অসীম ধৈর্য আর অটুট মনোবল কোন সময় তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে পারেনা।

আজ পূর্ণিমা রাত।

সমুদ্র তীরে বসে অনেক রাত অবধি গল্প করে বনহুর আর হুসনা।

এক সময় বলে বনহুর—মিস হুসনা যদি আপনি কিছু মনে না করেন তবে আপনার কোলে মাথা রেখে...কথা শেষ না করেই হাসে বনহুর।

হুসনা বলে উঠে—সচ্ছন্দে।

বনহুর হুসনার কোলে মাথা রেখে শুয়ে তাকায় জোছনা ভরা আকাশের দিকে।

বনহুর হুসনার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হুসনার বুক আনন্দে ভরে উঠে। অপূর্ব এক অনুভূতি নাড়া দেয় তার মনে তার শিরায় শিরায়। ধীরে ধীরে আংগুল চালায় সেও চুলের মধ্যে।

জোছনার আলোতে বনহুরের মুখমন্ডল অদ্ভূত সুন্দর লাগছিলো। হুসনা নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে থাকে ওর মুখে।

হুসনা ভাবে ওকে যদি সে এমনি করে চিরদিনের জন্য নিজের করে নিতে পারতো, তাহলে সে কোনদিন আর ফিরে যেতে চাইতোনা তার বাবা মা আত্মীয় স্বজনের কাছে। পৃথিবীর কোন আকর্ষণই তাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারতোনা ওর কাছ থেকে। কিন্তু হুসনা যা চায় তা কোনদিনই সম্ভব হবেনা এ কথা জানেনা সে। জানলে হয়তো এমন চিন্তাও হুসনা করতোনা।

মাঝে মাঝে হুসনা অবাক না হয়ে পারেনা। এতোদিন সে মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে একত্রে কাটিয়েও আজও তাকে চিনতে পারলোনা। হুসনার মনে হয়

মিঃ চৌধুরী তার কত আপন জন আবার কোন কোন সময় মনে হয় মিঃ চৌধুরী তার ধরা ছোয়ার বাইরে।

আজও হুসনা তাকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারলোনা। কিন্তু হুসনা যতই মিঃ চৌধুরীকে নিয়ে ভাবে ততই যেন সীমাহীন চিন্তার অতলে তলিয়ে যায়। মিঃ চৌধুরীকে নিয়ে ভাবতে ভাল লাগে হুসনার।

বনহুর বলে উঠে—কি ভাবছেন মিস হুসনা?

হুসনা আজ জবাব না দিয়ে পারেনা, বলে—ভাবছি আজও আপনাকে ঠিকভাবে চিনতে পারলামনা।

কেমন?

যেমন ধরুন আকাশের চাঁদ চোখে শুধু দেখা যায় কিন্তু...

বলুন থামলেন কেনো।

তাকে বোঝা যায় না।

মিথ্যে কথা মিস হুসনা। পৃথিবীর মানুষের কাছ থেকে চাঁদ এখন দূরে নাই। চাঁদকে মানুষ ঠিকই বুঝতে পেরেছে।

কিন্তু আপনি চাঁদের চেয়েও কল্পনার বস্তু মিঃ চৌধুরী।

তাই নাকি?

হাঁ।

হয়তো আপনার কাছে মিস হুসনা, আপনি আমায় অধিক ভালবাসেন তাই! একটা দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করে বলে বনহুর—কিন্তু আপনার ভালবাসার কোন প্রতিদান আমি দিতে পারলামনা।

কি যে বলেন, আমার জীবন রক্ষা করেছেন—তাছাড়া আপনি ছাড়া আমার যে কোন ভরসাই নেই মিঃ চৌধুরী। সত্যি সেদিন যদি জাহাজ ঈগলে আপনি যাত্রা হিসাবে না থাকতেন তাহলে আমার ভাগ্যে কি ঘটতো কে জানে।

মিস হুসনা এখনও আমি আপনাকে নিয়ে গভীর চিন্তায় আছি। যতদিন না আপনাকে আপনার বাবা মার কাছে পৌছে দিতে সক্ষম হয়েছি ততদিন আমার এ চিন্তা দূর হবে না। জানিনা সেইদিন কবে আসবে এবং সেই দিন

পর্যন্ত আপনাকে সাবধানে গচ্ছিত রাখতে পারবো কিনা। কথাগুলো বলে উঠে বসে বনহুর—চলুন এবার ফেরা যাক।

হুসনা কোন কথা না বলে উঠে দাঁড়ায়।

বুঝতে পারে হুসনা মিঃ চৌধুরী তাকে সাবধানে রক্ষা করে চলেছে। তাকে সে কলঙ্কিত করতে চায় না কিন্তু সে তো নিজ কে রক্ষা করতে পারেনি। জলদস্যু সর্দার তার দেহে মনে অপবিত্রতার কালিমা লেপন করে দিয়েছে। যা কোন দিন তার দেহ মনকে পবিত্র করবেনা।

মিঃ চৌধুরীর প্রতি একটা অনাবিল শ্রদ্ধা তাকে নত করে ফেলে।

কুন্দল দ্বীপে যখন হুসনা আর দস্যু বনহুর একই কুঠিরে ঘুমিয়ে আছে, তখন সুদুর কান্দাই শহরে প্রখ্যাত ডিটেকটিভ মিঃ ফারুক আহসান তার কন্যা হুসনার জন্য একেবারে উন্মাদ প্রায় হয়ে উঠেছেন, শুধু জনাব আহসানই নন তার স্ত্রীও উন্মাদিনী হয়ে পড়েছেন কারণ তাদের একমাত্র কন্যা আর দু'টি পুত্র সন্তান ছিলো। হুসনা তাঁদের আদরের ধন নয়নের মণি।

একমাত্র কন্যা বলেই জনাব আহসান সাহেব তার ইচ্ছা অনুসারে দূরদেশ জিহাংহায় পাঠিয়ে ছিলেন পড়া শোনার জন্য। তিনি কন্যাকে বিদেশ পাঠিয়ে কোনদিন ভাবেননি যে এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটবে বা ঘটতে পারে।

কয়েক মাস পূর্বের কথা, আহসান সাহেব অফিসে বসে কাজ করছেন। তাকে কান্দাই শহরে আনা হয়েছে দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করবার জন্য। শুধু আহসান সাহেবই নয় আরও কয়েকজন স্বনাম ধন্য গোয়েন্দা পুলিশ অফিসার এসেছে কান্দাই শহরে যদিও পুলিশ প্রধান জাফরী রয়েছেন, আরও রয়েছে তার সাঙ্গপাঙ্গ পুলিশ অফিসারগণ, তবু এসব নামী গোয়েন্দাদের নিয়ে আসা হয়েছে নতুনভাবে দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার ব্যাপার। প্রথমে লক্ষ টাকা ঘোষণা করা হয়েছিলো তারপর দু'লক্ষ ঘোষণা করা হয়েছে। আহসান সাহেব অফিসে বসে দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার ব্যাপারে নিয়েই আলাপ আলোচানা করছিলেন এবং পুলিশ রিপোর্টগুলি ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখছিলেন। অবশ্য তিনি যে কান্দাই নতুন এসেছেন তা নয় বেশ কিছুদিন হলো তিনি কান্দাই এসেছেন আর দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার নিয়ে অনেক প্রচেষ্টাও চালিয়ে চলেছেন। ইতিপূর্বে আরও অনেকে এসেছেন তাঁরা শেষ পর্যন্ত দস্যু বনহুর

গ্রেপ্তারে সক্ষম না হয়ে বিমুখ হয়ে ফিরে গেছেন। এসব কারণে আহসান সাহেব চান তিনি যেন বিমুখ হয়ে না ফেরেন।

মনোযোগ সহকারে দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার ব্যাপারের রিপোর্টগুলি পরীক্ষা করে দেখছিলেন এমন সময় জিহাংহা থেকে একটি তার বার্তা বহন করে আনে তার আদরিনী কন্যার নিখোঁজ সংবাদ।

এ সংবাদে আহসান সাহেব প্রায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। যখন জানতে পারলেন জাহাজ ঈগলে হুসনা দেশে ফিরছিলো জাহাজে জলদস্যু আক্রমণ চালায় তারপর হুসনাকে তার ক্যাবিনে পাওয়া যায় নি।

আহসান সাহেব পরদিনই প্লেন যোগে জিহাংহায় রওয়ানা দিলেন। সন্ধান করে ছিলেন জিহাংহার বহুস্থানে, পাগলের মত ঘুরেছিলেন তিনি। জিহাংহার পুলিশ বাহিনী তাকে নানা ভাবে সাহায্য করেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত-হতাশ হয়ে আহসান সাহেব ফিরে এসেছিলেন কান্দাই শহরে।

এরপর থেকে আহসান সাহেব একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। বিশেষ করে স্ত্রী-হাবিবার অবস্থা তাঁকে একেবারে নিরাশার অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে ফেললো। পুত্র সন্তান দুটি এখনও আপ্রাপ্ত বয়স্ক। সংসারে এখন মাত্র তিনিই একা একজন উপার্জনশীল ব্যক্তি। স্ত্রীর অবস্থা তাঁর ধৈর্য্যচুতি ঘটালেও তিনি সম্পূর্ণ নীরব থাকতে পারলেন না, কিছুদিন পর তিনি পুনরায় কাজে যোগ দিলেন।

কাজে যোগ দিলেন আহসান সাহেব কিন্তু সব সময় কাজেই মগ্ন রইলেন না তিনি দেশ বিদেশে কন্যার সন্ধানে পুলিশ বিভাগকে জানিয়ে রাখলেন এবং খোঁজ খবর নিতে লাগলেন।

মাসের পর মাস গড়িয়ে চললো।

ক্রমেই হতাশায় ভরে উঠতে লাগলো আহসান সাহেবের মন। তিনি স্ত্রীকে কিছুতেই আর প্রবোধ দিতে পারছিলেন না। নিজে অসীম ধৈর্য নিয়ে কাজ করতেন, নিজকে কাজের-মধ্যে ডুবিয়ে রেখে কন্যার স্মৃতি ভুলে থাকতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু স্ত্রীর মুখের-দিকে তাকিয়ে তিনি ধৈর্য হারিয়ে ফেলতেন।

দিন দিন আহসান সাহেব আরও যেন কঠিন হয়ে উঠছিলেন। হুসনাকে জলদস্যু ধরে নিয়ে গেছে। না জানি সে বেঁচে আছে না মরে গেছে। কি

অবস্থায় জলদস্যুরা তাকে রেখেছে। তার উপর কি ধরনের নির্যাতন চালাচ্ছে কে জানে। পুলিশ গোয়েন্দা বিভাগের জাঁদরেল অফিসার আহসান সাহেব তারই আদরিনী কন্যার আজ এই অবস্থা। আহসান সাহেবের রাগ আরও বেড়ে গেছে দস্যু বনহুরের উপর। কারণ জলদস্যুরা তো বনহুরের মতই দস্যু।

কথায় বলে যে লোক কোন অন্যায় করে তার প্রতি আক্রোশ গিয়ে পড়ে তার উপর তেমনি জলদস্যুর প্রতি যে রাগ সেই রাগ বা ক্রোধ এসে পড়ে দস্যু বনহুরের উপর।

যেমন করে হোক দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম না হবেন, ততদিন বিশ্রাম তিনি করবেননা বলে শপথ নিয়েছেন।

অবশ্য বনহুর গ্রেপ্তার ব্যাপারে যে জনাব আহসান সাহেবই আজ এমন ভাবে উঠে পড়ে লেগেছে তা নয়। অনেক দিন থেকেই দস্যু বনহুরকে নিয়ে কান্দাই পুলিশ মহল চরমভাবে মাথা ঘামাচ্ছে।

দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার ব্যাপারে পুলিশ বিভাগে প্রতি বছরে হাজার হাজার টাকা ব্যয় হয়ে থাকে এটা যেন পুলিশ বিভাগের চিরা চরিত নিয়ম ধারা, যাহোক পরিত্রাণ নাই। কিন্তু আহসান সাহেব এসব নিয়ম ধারার ব্যতিক্রম, তার জেদে তিনি বনহুরকে গ্রেপ্তার করবেনই। তিনি পুরস্কার চান না, চান প্রতিশোধ।

কয়েকদিন পূর্বে দস্যু বনহুর ভ্রমে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিলো। আহসান সাহেব তাকে নিজে শাস্তি দেবেন বলে পুলিশ বিভাগের কাছে অনুমতি পর্যন্ত চেয়ে নিয়েছিলেন কিন্তু মিঃ জাফরী তাকে সনাক্ত করার পর জানান সে দস্যু বনহুর নয়। তবে সেও যে একজন অভিজ্ঞ ডাকাত এ ব্যাপারে জাফরী প্রমাণ করেছিলেন।

বনহুরের আস্তানায় আবার একটা দুঃচিন্তার ছায়া ঘনিভূত হয়ে এসে ছিলো। জিহাংহায় থাকা কালে বনহুর ওয়্যারলেসে তার সব সংবাদ জানিয়ে ছিলো রহমানের কাছে। অচিরেই বনহুর জিহাংহা থেকে রওয়ানা দিবে এ সংবাদও সে দিয়েছিলো।

রহমান এবং আস্তানায় বনহুরের অনুচরগণ খুশি হয়েছিলো কথাটা শুনে। কারণ বহুদিন সর্দার আস্তানা ছাড়া। তাদের কাজ যদিও চলেছে তবু

সর্দারের অনুপস্থিতি তাদের মনকে সদা সর্বদা বিষণ্ন করে রাখে। সব কাছে তেমন একটা উৎসাহ পায়না তারা কিন্তু সর্দার জিহাংহা থেকে রওয়ানা দেবার পর আর কোন সংবাদ পায়নি। বনহুরের বিভিন্ন আস্তানায় খোঁজ নিয়েও কোন ফল ফেলনা রহমান। বিভিন্ন আস্তানা থেকে বনহুরের বিশ্বস্ত অনুচরগণ জানালো সর্দার তাদের কাছে কোন সংবাদ দেয়নি বা নিজেও গিয়ে পৌঁছেনি।

রহমান এ সংবাদ নূরীকে না জানালেও যে কোন উপায় জেনে ফেলে। এবং চিন্তিত হয়ে পড়েছিলো ভীষণ ভাবে। সব সময় উদাসীন হয়ে ভাবে বনহুরের কথা। ছোট্ট ছেলে জাভেদ পর্যন্ত এখন বুঝতে শিখেছে। মাকে সে চিন্তিত দেখে একদিন প্রশ্ন করে বসে—আম্মি তুমি কি ভাবছো বলোনা? বাপুর কথা ভাবছো বুঝি?

বুকে টেনে নিয়ে বলে নূরী—হাঁ বাপ তোর বাপুর জন্য ভাবছি।

কেনো আম্মি? বাপু কেনো আসে না?

জানিনা।

আম্মি তুমি ভেবোনা বাপু ঠিক এসে যাবে। চলো আমাকে তীর চালানো শেখাবে। চলো আম্মি চলো......

জাভেদ নূরীর হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে।

জাভেদকে নিয়ে নূরী তীর ধনু শেখায়।

অস্ত্র চালনা শেখায় রহমান আর কায়েস শেখায় মল্ল যুদ্ধ করা। আর অশ্ব চালনা শিখবে জাভেদ তার পিতার কাছে।

মায়ের কাছে জাভেদ লেখা পড়ায় হাতেখড়ি পেলেন রহমান তাকে পড়া শোনা করায়। নূরী লেখাপড়া জানেনা শুধু শিশু শিক্ষার কয়েক পাতা শিখে ছিলো তার পিতার কাছে।

বনহুর একদিন রহমানকে বলেছিলো, যেমন করে হউক জাভেদকে পড়া শোনা শেখাতে হবে রহমান তুমি ওর দায়িত্ব গ্রহণ করো।

রহমান বলেছিলো—তাই করবো সর্দার।

সেদিনের পর থেকে রহমান জাভেদের শিক্ষা দীক্ষা নিয়ে ভাবতো।

সকাল আর সন্ধায় পড়ার জন্য রহমানের আদেশে মাষ্টার নিজে ওকে নিয়ে বসতো। মনোযোগ সহকারে লেখাপড়া করাতো সে জাভেদকে।

দুপুরে মল্লযুদ্ধ এবং অস্ত্র শিক্ষা চলতো।

বৈকালে মায়ের কাছে তীর ধনুক চালনা শিক্ষা এই ছিলো জাভেদের নিয়ম ধারা।

রহমান একদিন এসে বললো—নূরী।

নূরী কিছু করছিলো চোখ তুলে তাকালো—বলো?

নূরী সর্দার অনেক দিন হলো বাইরে গেছে কবে ফিরবে তাও জানিনা। বাড়িতে জাভেদের পড়াশোনা শেষ হয়েছে।

তা এখন কি করতে চাও রহমান ভাই?

সহজ স্বাভাবিক গলায় বললো রহমান—ওকে স্কুলে ভর্তি করতে চাই।

অবাক কণ্ঠে বললো নূরী—শহরের স্কুলে?

হাঁ।

কিন্তু......

কিন্তুর কি আছে! রোজ আমি ওকে স্কুলে দিয়ে আসব।

পারবে তুমি রহমান ভাই?

হাঁ পারবো।

পরদিন জাভেদকে সুন্দর করে সাজিয়ে দেয় নূরী। কেউ দেখলে বলতে পারবেনা সে জঙ্গলে বাস করে এবং সে দস্যু সন্তান। সুন্দর ফুট ফুটে চেহারা, মাথায় এক মাথা কোঁকড়ানো চুল। ডাগর ডাগর দুটি চোখ, নীল সচ্ছ সে চোখের দৃষ্টি।

রহমান জাভেদ সহ অশ্ব পৃষ্ঠে চেপে বসবার পূর্বে নূরী রহমানকে লক্ষ্য করে বললো—ওর আব্বুর নাম জিজ্ঞাসা করলে কি নাম বলবে?

রহমান বললো—মনির চৌধুরী।

কোন অসুবিধা হবে না তো?

অসুবিধা হবে কেনো? তুমি কিছু ভেবোনা নূরী।

জাভেদ বললো—আম্মি বাপুর আর এক নাম মনির চৌধুরী বুঝি?

হাঁ।

রহমান ততক্ষণে জাভেদকে অশ্ব পৃষ্ঠে তুলে দিয়ে নিজেও চেপে বসেছে। নূরীকে লক্ষ্য করে বলে রহমান—খোদা হাফেজ।

নূরীও অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করে—খোদা হাফেজ...

ওরা চলে যায়।

নূরী দাঁড়িয়ে থাকে, দৃষ্টি তার দূরে বহু দূরে জঙ্গলের যত দূর দেখা যায় ততদূরে চলে গেছে।

এমন সময় পাশে এসে দাঁড়ায় নাসরিন, সঙ্গে তার কন্যা ফুল।

নাসরিন বলে—নূরী একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো সঠিক জবাব দেবে!

নূরী ফুলকে আদর করতে করতে বলে—দেবো?

তুমি নূরকে বেশি ভালোবাস না জাবেদকে?

নূরীর ভ্রূজোড়া কুঞ্চিত হয়, একটু চিন্তা করে বলে—তোর প্রশ্ন অদ্ভুত নাসরিন। আমি তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো তার মধ্যেই খুঁজে পাবি তোর প্রশ্নের জবাব।

বেশ করো?

তুই কাকে বেশি ভালবাসিস, আমাকে না বনহুরকে?

তোমরা দুজনাই যে আমার একান্ত প্রিয়। তোমাদের দুজনাকেই আমি এক রকম ভালবাসি। এবার বুঝতে পেরেছি নূরী, তুমি জাভেদকে যেমন ভালবাসো তেমনি ভালবাসো নুরকে...

নাসরিন নূর আমার সাধনার ধন আর আর জাভেদ আমার কামনার রত্ন। আমার হুরের স্মৃতি এরা দু'জনা—...একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে নূরী।

ফুল খেলা করছিলো। নূরী ফুলকে আদর করে বললো—ফুল বলো তো কে ভাল তোমার আম্মি না আমি?

ফুল বললো—তোমরা দু'জনাই ভাল।

নূরী ওর সুন্দর ফুটফুটে গালে চুমু দিয়ে বললো—লক্ষ্মী মেয়ে ঠিক বলেছো। আম্মিকে ভাল বললে আমি তোমায় চুমু দিতাম না তখন অভিমান হতো তাই না?

ফুল মাথা কাৎ করে বলে—হুঁ।

এমন সময় বৃদ্ধা দাইমা আসে। আজকাল সে বড্ড বুড়ো হয়ে গেছে চোখে তেমন দেখে না।

নূরী আর নাসরিনের গলার আওয়াজ পেয়ে বলে বৃদ্ধা—এখানে কি করছিস তোরা? বনহুরের কোন খোঁজ পেলি?

নূরী বললো—না দাইমা ওর কোন খোঁজ আজও পেলাম না। জানি না সে কেমন আছে।

নাসরিন বললো—আমার মন বলছে সে ভাল আছে। নূরী তুমি ভেবোনা সর্দারের কোন বিপদ ঘটেনি।

দাইমাও নাসরিনের কথায় যোগ দিয়ে বললো—হাঁ আমারও মন বলছে বনহুর ভাল আছে।

নূরী বাষ্পরুদ্ধ গলায় বললো—বিপদের সঙ্গে সর্বদা যার মোকাবেলা সে কেমন করে ভাল থাকতে পারে দাইমা? আমার যেন কেমন ভয় হচ্ছে......

হেসে উঠে বৃদ্ধা—ভয়! ভয় করছিস আমার সর্দারের জন্য? কোন ভয় নেই, ওরে ওর জন্য কোন ভয় নেই। খোদা কোন দিন ওর ক্ষতি করবে না, সর্দার কোন দিন কারো ন্যায় ছাড়া অন্যায় করেনা... অন্যায় করে না......

নূরী আর নাসরিন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে বৃদ্ধার মুখের দিকে।

বৃদ্ধা কথাগুলো উচ্চারণ করতে করতে চলে যায় সেখান থেকে।

❑

বনহুর ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে ঝোপের ভিতর থেকে। জংলী রাণীর সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। আজ জংলীরাণীর হাতে তীর ধনু থাকা সত্ত্বেও সে বনহুরকে লক্ষ্য করে তীর ধনু তুলে ধরে না। শুধু ডাগর ডাগর চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে।

বনহুর স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে জংলীরাণীর মুখে।

কয়েক মিনিট স্থির হয়ে উভয়ে উভয়কে লক্ষ্য করে তারপর হঠাৎ জংলীরাণী ছুটে পালিয়ে যায়।

বনহুরের ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠে একটা হাসির রেখা। ফিরে যায় বনহুর জেলে পাড়ায় তার সেই কুঠিরে।

হুসনা প্রশ্ন করে—কেনো আর মাছ ধরতে যান না আপনি?

হেসে বলে বনহুর—মাছ ধরতে না গেলেও কিছু একটা ধরতে যাই।

কিছু একটা!

হ্যাঁ মিস হুসনা।

বলুন কি—সে কিছু?

বলবো কিন্তু আজ নয়......

হুসনার মনে জানার বাসনা জাগলেও সে পুনরায় প্রশ্ন করতে পারেনা। সে জানে যা বলবার তা মিঃ চৌধুরী আপনার থেকেই বলবে আর যা বলবার নয় তা সে কিছুতেই বলবেনা।

কিন্তু প্রতিদিন মিঃ চৌধুরী কাউকে কিছু না জানিয়ে যায় কোথায়।

একদিন হুসনা জেলে বাবার কাছে গিয়ে বললো—জেলে বাবা রোজ তোমার বাবু কোথায় যায় আমি জানিনা তুমিও জানোনা। বলতে পারো কোথায় সে রোজ যায়?

জেলে বাবার চোখে মুখে একটা দুঃচিন্তার ছায়া পড়ে। কেমন যেন ভীত আতঙ্কিত কণ্ঠে বলে—বৌরাণী বাবু নিশ্চয়ই এমন কোন জায়গায় যায় যা সে তোর কাছে আমার কাছে গোপন করে রেখেছে। মনে হয় সে রোজ জঙ্গলে যায়।

জঙ্গলে যায়! কিন্তু কেনো—কেনো সে জঙ্গলে যায় জেলে বাবা?

তাই তো আমিও ভাবছি বৌরাণী। যদি তুই বলিস তবে আমি বাবুর সঙ্গে একদিন যাবো।

সঙ্গে নয় জেলে বাবা তোমাকে যেতে হবে আত্মগোপন করে। জানলে সে কিছুতেই তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেনা।

বেশ আমি গোপনে যাবো, দেখবো রোজ বাবু কোথায় যায়।

সেদিন জেলেবাবা মাছ ধরতে যাবে বলে জাল বের করলো কিন্তু আসলে সে মাছ ধরতে গেলোনা ফিরে এলো ডিঙ্গি নৌকা থেকে। সকলের অলক্ষে সে বনহুরকে লক্ষ্য করতে লাগলো।

বনহুর খাটিয়ায় শুয়ে বিশ্রাম করছিলো।

জেলে বাবা দরজার আড়াল থেকে তাকে দেখলো তারপর ঘরের বেড়ার পাশে গিয়ে চুপ চাপ দাঁড়িয়ে রইলো।

হুসনাও আজ সব সময় লক্ষ্য রেখেছে মিঃ চৌধুরী কখন কোথায় যায় সে দেখবে।

বনহুর চুপ চাপ শুয়েছিলো।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেলো, আড়ালে দাঁড়িয়ে বুড়ো বাবার পা ব্যথা হয়ে উঠলো।

হুসনাও অধৈর্য হয়ে উঠেছে। কই আজ তো মিঃ চৌধুরী বের হলো না। এক সময় বললো হুসনা—মিঃ চৌধুরী আজ বাইরে গেলেন না কেনো?

শরীর ভাল নেই মিস হুসনা।

সত্যি!

হ্যাঁ।

দেখি! হুসনা বনহুরের মথায় হাত রাখলো।

বনহুর হেসে বললো—জ্বর নয় মাথা ব্যথা।

মাথা টিপে দেবো?

না থাক।

জেলে বাবাকে ডাকবো!

বনহুর পূর্বের মত হেসে বললো—জেলে বাবা তো মাছ ধরতে গেছে।

হঠাৎ হুসনা যেন কিছুটা বিব্রত হয়ে পড়ে বলে—মনে ছিলোনা জেলে বাবার কথা।

সেদিন পাহারা দিয়ে কোন ফল হলোনা জেলে বাবার। কারণ বাবু আজ কোথাও গেলোনা।

হুসনা কিন্তু ভিতরে ভিতরে খুব খুশি। এমনি করে রোজ যদি মিঃ চৌধুরী তার পাশে থাকতো। হুসনা মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

এখানে যখন হুসনা বনহুরকে কাছে পেয়ে অনাবিল আনন্দে ভরপুর তখন কুন্দল দ্বীপের গভীর জঙ্গলে হ্রদের পাশে জংলী রাণী কিসের যেন সন্ধানে চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো। চঞ্চল হারিণীর মত ব্যাকুল তার দৃষ্টি ঝোপ ঝাপ সব খুঁজলো। ছিড়ে ফেললো তীর ধনুক লাগাম। ছুড়ে ফেলে দিলো হ্রদের জলে।

এক সময় ফিরে চললো সে তার আস্তানায়।

জংলীরাণী কথা বলতে পারেনা কিন্তু তার মনে আছে ব্যথা বেদনা সব কিছু। সে যখন ফিরে গেলো তখন তাকে বড় বিষণ্ন ম্লান মনে হচ্ছিলো।

পরদিনও জেলে বাবা মাছ ধরার নাম করে বেরিয়ে পড়লো। এমন কি জাল নিয়ে উঠে পড়লো সে জেলে নৌকায়। অবশ্য হুসনার সঙ্গে গোপনে কথা হয়েছিলো সে মাছ ধরতে যাবেনা। বাবু কোথায় যায় তাই সে দেখবে।

বনহুর সেদিনও গেলোনা, যদিও তার মনটাও জংলী রাণীর জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলো। তবু মনোভাব গোপন রেখে চুপ রইলো সে।

হুসনার মনের আনন্দ ফুটে উঠেছে তার চোখে মুখে। সব সময় নানা কথাবার্তায় বনহুরকে আনন্দ মুখর করে তোলার চেষ্টা করছে সে।

দু'দিন পর বনহুর পা বাড়ালো জঙ্গলের পথে।

পিছনে আত্মগোপন করে এগিয়ে চললো জেলে বাবা। কোথায় যায় বাবু দেখবে সে।

জেলে বাবা গাছ-গাছড়ার আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলো হঠাৎ বাবুকে আর সে দেখতে পায়না। বাবু গেলো কোথায়? এদিক ওদিক তাকাচ্ছে জেলে বাবা বাবুর সন্ধানে।

পিছন থেকে কেউ তার কাঁধে হাত রাখে।

চমকে ফিরে তাকায় জেলে বাবা। সঙ্গে সঙ্গে মুখখানা তার সংকুচিত হয়ে পড়ে।

বনহুর বুঝতে পারে জেলে বাবা লজ্জিত বিব্রত হয়ে পড়েছে। হেসে বলে বনহুর জানি তুমি কেন এসেছো। তুমি আজ ক'দিন ধরে মাছ ধরার নাম করে আমাকে পাহারা দিয়েছো—সব জানি। তাই তো আমি বের হইনি বুঝলে বাবা!

বাবু......

লজ্জার কোন কারণ নাই। চলো বাবা ঐ গাছটার নিচে বসি। কয়েকটা কথা আছে তোমার সঙ্গে।

জেলে বাবা অনুসরণ করে বনহুরকে।

অদূরে একটা গাছের নিচে এসে বসে বনহুর।

জঙ্গলটা এখানে সবে শুরু তাই এ জায়গায় তেমন কোন ভয়ের কারণ নাই। এখানে তেমন কোন হিংস্র জীব-জন্তুর আনাগোনাও নাই।

বনহুর বললো—বসো জেলে বাবা।

জেলে বাবাও বসলো।

কিন্তু জেলে বাবার মুখে এখনও সংকুচিত ভাব কারণ সে বাবুকে লুকিয়ে লুকিয়ে অনুসরণ করছিলো তাই। বললো বনহুর---জেলে বাবা জানি তোমরা সবাই আমাকে খুব ভালবাসো। আর ভালবাসো বলেই আজ তুমি আমাকে অনুসরণ করেছো। আমি কোথায় যাই, কি করি এটাই জানার জন্য তোমরা উন্মুখ। শুধু তোমরা নও মিস হুসনাও অত্যন্ত আগ্রহী। জানো, জেলে বাবা কেনো তোমাদের কাছে গোপন করে আমি জঙ্গলে যাই? তোমরা জানলে আমাকে কিছুতেই জঙ্গলে যেতে দেবেনা তাই।

বাবু জঙ্গলে বড় ভয়। তুইতো জানিস বাবু জংলী রাণী কত ভয়ঙ্কর মেয়ে। যদি তোকে দেখে তা হলে জান নিয়ে ফিরতে পারবি না। তোকে একবার সে খুন করেছিলো আবার সে খুন করবে।

বনহুর হেসে বললো—জেলে বাবা জংলী রাণীকে তোমার এতো ভয় কেনো?

ওর হাতে বিষ মাখানো তীর ধনু আছে। ও যাকে দেখে তাকেই খুন করে। খুন করা তার নেশা—বাবু খুন করা তার নেশা।

জেলে বাবু তুমি না বলেছিলে মেয়েটাকে তুমিই প্রথম উদ্ধার করেছিলে?

হাঁ করেছিলাম, সবতো তোকে বলেছি বাবু।

তুমি মেয়েটাকে পেলে নিজের সন্তানের মত করে মানুষ করতে তাও বলেছিলে সেদিন।

হাঁ বাবু করতাম কিন্তু আমার ভাগ্য খারাপ তাই—মেয়েটাকে হাতে পেয়েও হারিয়েছিলাম। গলাটা ধরে আসে জেলে বাবার।

বনহুর বলে—জেলে বাবা তুমি যদি এখন জংলী রাণীকে ফিরে পাও......

কথা শেষ হয়না বনহুরের জেলে বাবার মুখ কালো হয়ে উঠে, ভয় বিহ্বল কণ্ঠে বলে—বাবু মাফ কর আমি জংলী রাণীকে চাইনা।

হেসে উঠে বনহুর তারপর বলে—তাকে তোমার এতো ভয় জেলে বাবা?

ভয়! ও বড় ভয় বাবু ওর হাতে সব সময়......

মরণ অস্ত্র এইতো?

হাঁ বাবু। একটু থেমে বলে—ওকে চাইনা বাবু।

যদি সে—তোমার আমার মত ভাল মানুষ হয়?

জংলীরাণী আমার মত তোর মত ভাল মানুষ হবে বলিস কি বাবু? যদি হয়?

তা হলে আমি ওকে বুকে টেনে নিতাম আমার মেয়ের মত করে।

সত্যি জেলে বাবা ওকে পেলে তুমি খুশি হবে?

কিন্তু সে যে চিন্তার বাইরে বাবু। কোনদিন জংলীরাণী ভাল মানুষ হবেনা।

আচ্ছা জেলে বাবা তাকে যদি আমি মানুষরূপে তৈরি করে তোমার হাতে তুলে দিতে পারি।

আনন্দে উজ্জল হয়ে উঠে জেলে বাবার মুখ। সে বনহুরের হাত দু'খানা চেপে ধীরে উচ্ছল কণ্ঠে বলে উঠে—বাবু।

বলে বনহুর—জেলে বাবা তুমি ফিরে যাও। তোমার হাত ধরে শপথ করলাম জংলীরাণীকে মানুষ আকারে পরিণত করবো তারপর তুলে দেবো তোমার হাতে। কিন্তু যতদিন জংলীরাণীকে আমি স্বাভাবিক মানুষ আকারে গড়ে নিতে পেরেছি ততদিন এ কথা মিস হুসনার কাছে বলোনা।

আচ্ছা বাবু বলবোনা। কিন্তু......

বুঝতে পেরেছি মিস হুসনা তোমাকে আমার পাহারাদার হিসাবে পাঠিয়েছে। আমি কোথায় যাই জেনে নিয়ে তাকে জানাতে হবে।

হাঁ বাবু বৌরাণী এ কথাই বলেছে।

শোন জেলে বাবা তুমি গিয়ে বলবে—বাবু জঙ্গলে হরিণ খুঁজতে যায়। যে হরিণের নাভিতে আছে কস্তুরী সেই হরিণ তার চাই...... মৃগনাভি কস্তুরী বুঝলে?

আচ্ছা তাই বলবো।

তবে যাও আর কোন দিন যেন এসোনা।

আসবোনা বাবু। তুই যা জংলী রাণীকে আমি মেয়ে করে নেবো...তুই যা বাবু...জেলে বাবা চলে যায়।

বনহুর পা বাড়ায় জঙ্গল অভিমুখে।

ফিরে আসে জেলে বাবা।

হুসনা উন্মুখ হয়ে প্রতিক্ষা করছিলো, জেলে বাবা ফিরে আসতেই ছুটে গিয়ে তার সম্মুখে দাঁড়ায়—জেলে বাবা তুমি গিয়েছিলে?

হাঁ বৌ-রাণী গিয়েছিলাম।

একটা জল চৌকি এগিয়ে দিয়ে বলে—বসো জেলে বাবা?

জেলেবাবা বসে পড়ে, গামছায় হাওয়া খেতে খেতে বলে— বৌ-রাণী বাবু রোজ কেন জঙ্গলে যায় জানিস?

কেন—কেন যায় জেলে বাবা?

হরিণ খুজতে যায়।

হরিণ?

হাঁ । যে হরিণের নাভিতে কস্তুরী আছে সেই হরিণ তার চাই।

দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে তাকায় হুসনা জেলে বাবার দিকে। মিঃ চৌধুরী বলেছিলো জঙ্গলে কিছু খুজতে যায় সে। তবে সে হরিণ খুঁজতে যায়। কস্তুরী...মৃগনাভী কস্তুরী তার প্রয়োজন। কিন্তু মৃগনাভি কস্তুরী দিয়ে কি করবেন তিনি।

হুসনা গভীর চিন্তায় তলিয়ে যায়।

জেলে বাবা সেদিনের পর থেকে বিপুল আগ্রহ নিয়ে প্রতিক্ষা করতে থাকে। বাবু কথা দিয়েছে জংলীরাণীকে সে মানুষ করে ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু যতই আনন্দ হোক...মনে মনে তার একটা সন্দেহের ছোঁয়া নাড়া দিচ্ছিলো। কারণ জংলীরাণী কতখানি ভয়ঙ্কর তা জানা ছিল জেলে বাবার।

বনহুর জেলে বাবার কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলো ঐ হ্রদের পাশে, ঝোপের আড়ালে আত্নগোপন করে লক্ষ্য করলো। ভাল করে তাকাতেই দেখতে পেলো অদূরে একটি উঁচু টিপির উপর বসে আছে জংলীরাণী।

জংলীরাণী তাকিয়ে আছে হ্রদের দিকে। মুখোভাব বিষণ্ন মলিন। পিঠে তীর ধনু বাঁধা। পরনে হরিণের চামড়া কিন্তু দেহের উপর অংশ সম্পূর্ণ খোলা। লম্বা চুলগুলো ছড়িয়ে আছে কাঁধে পিঠে বুকে।

বনহুর ঝোপের ভিতর থেকে লক্ষ্য করলেও তাকে জংলীরাণী দেখতে পায়নি। এবার বনহুর ঝোপের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে অতি সন্তর্পণে। দূর থেকে সে শিস দেয়, সঙ্গে সঙ্গে ফিরে তাকায় জংলী রাণী।

বনহুরকে দেখা মাত্র জংলী রাণী উঠে দাঁড়ায়। ওর চোখ দুটো খুশিতে দীপ্ত হয়ে উঠেছে। বনহুর এগুতে থাকে।

জংলী রাণী আজ নিজের পিঠ থেকে তীর ধনু খুলে নেয়না। সে যেমন দাঁড়িয়েছিলো তেমনি থাকে।

বনহুর এসে দাঁড়ায় ওর সম্মুখে।

জংলী রাণী কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে বনহুরের দিকে তাকিয়ে দেখলো, কিছু যেন বলতে চায় সে।

বনহুর বুঝতে পারে কেনো যে দু'দিন আসেনি এ কথাই জংলীরাণী বলতে চায় কিন্তু বলতে পারে না। চোখের দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে তার অন্তরের ভাষা।

আজ জংলী রাণী ছুটে পালিয়ে যায়না।

বরং সে সরে আসে আরও কাছে।

বনহুর একটা জংলী ফুল তুলে নিয়ে ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে—নাও।

জংলী রাণী অবাক চোখে একবার ফুলটির দিকে তাকায় একবার বনহুরের মুখে কিন্তু হাত বাড়াবার সাহস তার হয়না।

বনহুর হেসে বলে—নাও......

জংলী রাণী এবার কম্পিত হাতখানা বাড়িয়ে ফুলটা নেয় তারপর ছুড়ে ফেলে দেয় মাটিতে।

বনহুর বুঝতে পারে জংলী রাণী ফুলের মর্যাদা বোঝেনা আর বোঝেনি সে ফুল নিয়ে কি করবে। ফুলটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

বনহুর ওর দিকে হাত বাড়িয়ে ওর হাতখানা ধরে তারপর বলে—এসো।

জংলী রাণী হয়তো বুঝতে পারেনা তবু সে বনহুরের সঙ্গে এগিয়ে যায়।

বনহুর ওর হাত ধরে উঁচু টিপিটির উপর ওকে বসিয়ে দিয়ে নিজে বসে ওর পাশে। জংলীরাণী কথা বলতে জানেনা—শুধু তাকিয়ে থাকে তার দিকে।

হঠাৎ কি মনে করে উঠে দাঁড়ায় জংলী রাণী। বনহুর ওকে বাধা দেয়না।

জংলীরাণী চলে যায় একটু পরে একটা জংলী ফুল নিয়ে ফিরে আসে, ফুলটা বনহুরের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে উঠে—নাও।

জংলী রাণীর কণ্ঠে শব্দ উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বনহুর উচ্ছসিত আনন্দে জংলী রাণীকে জাপটে ধরে বলে উঠে—জংলী রাণী তুমি কথা বলেছো? তুমি কথা বলেছো...

জংলী রাণী কিছু বুঝতে না পেরে হতবুদ্ধির মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে!

বনহুরের আনন্দ উচ্ছাস কমে যেতেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি জংলীরাণীকে বাহু বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেয় তারপর হেসে বলে—ফুল দাও।

জংলী রাণী তাকিয়ে দেখে তার সম্মুখে বনহুরের হাত পাতা রয়েছে। যেমন ছোট্ট শিশুর সম্মুখে কেউ হাত পাতলে তার খেলনাটা তুলে দেয় তেমনি জংলী রাণী নিজের হাতের ফুলটা তুলে দেয় বনহুরের হাতে।

বনহুরের আনন্দ আর ধরেনা, জংলীরাণী আজ কথা বলেছে। "নাও" উচ্চারণটা সে স্পষ্ট করতে পেরেছে, বলে বনহুর—জংলী রাণী তুমি কথা বলেছো আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে তোমাকে বোঝাতে পারবোনা।

জংলী রাণী হয়তো কি ভাবছে সেই জানে,. সে শুধু তাকিয়ে থাকে নীরবে।

বনহুর এক সময় বিদায় নিয়ে ফিরে যায় জেলে পাড়ায়।.

জংলী রাণী ফিরে যায় তার আস্তানায়।

আজ বনহুর ফিরে গেলে এগিয়ে আসে হুসনা—মিঃ চৌধুরী আজ আপনাকে বড় আনন্দ মুখর লাগছে। মৃগনাভি কস্তুরীর সন্ধান পেয়েছেন বুঝি?

হয়তো পাবো তারই সন্ধান পেয়েছি।

সত্যি মিঃ চৌধুরী?

হাঁ! ছোট জবাব দেয় বনহুর।

হুসনা বলে—মিঃ চৌধুরী মৃগনাভি কস্তুরী দিয়ে আপনি কি করবেন?

আপনি যে প্রশ্ন করলেন তার জবাব আজ দেওয়া সম্ভব নয় মিস হুসনা। যেদিন মৃগনাভি কস্তুরী নিয়ে আসতে পারবো সেইদিন বলবো আপনাকে সব কথা।

বেশ আমি প্রতিক্ষা করবো সেইদিনের।

পরদিন বলে হুসনা—মিঃ চৌধুরী অনেক কয়টা দিন হলো আমরা মাছ ধরতে যাই না, চলুন আজ মাছ ধরতে যাই?

যদি খুশি হন তবে চলুন। বললো বনহুর।

হুসনার মুখে খুশির উচ্ছ্বাস ফুটে উঠলো।

বনহুর আর হুসনা জেলেদের সঙ্গে মাছ ধরতে চললো। এক সঙ্গে এগিয়ে চলেছে অনেকগুলো জেলে নৌকা। প্রত্যেকটা নৌকার মাঝিরা জাল নিয়ে প্রস্তুত হয়ে বসে আছে। নৌকায় বৈঠা মারছে দু'জন করে জেলে।

যে নৌকায় বনহুর আর হুসনা ছিলো সে নৌকায় চুমকী এবং আরও কয়েকজন জেলে তরুণী ছিলো। বনহুর আর একজন জেলে বৈঠা টানছে।

চুমকী বললো—বাবু তোরা গান শুনবি?

বনহুর তাকালো হুসনার মুখে।

হুসনা বললো—শুনবো। বলুন মিঃ চৌধুরী ওদের গান গাইতে বলুন।

বনহুর বললো—বেশ গান গাও তোমরা।

চুমকী আর তার সঙ্গীরা গান গাইতে শুরু করলো। ছেলেমেয়েদের অদ্ভুত গান।

গানের তালে তালে নৌকাগুলো এগিয়ে চলেছে।

বনহুর আর হুসনার আনন্দ যেন ধরে না। জেলেদের সঙ্গে এমন করে তো তারা কোনদিন কাটায়নি। কুন্দল দ্বীপে নতুন এক জীবন পেয়েছে বনহুর আর হুসনা।

সারাটা দিন জেলেরা মাছ ধরে।

মাছ ধরে বনহুর আর হুসনা।

অবশ্য হুসনা মোটেই মাছ ধরতে পারেনা, শুধু বনহুরকে সহযোগীতা করাই তার কাজ।

মাছ ধরতে ধরতে হঠাৎ এক সময় বনহুর আনমনা হয়ে গেলো। জাল তুলে নিয়ে কি যেন ভাবতে লাগলো সে।

হুসনা লক্ষ্য করলো বনহুরের এই আনমনা ভাবটা। বললো— কি ভাবছেন মিঃ চৌধুরী?

হুসনার কথায় সম্বিৎ ফিরে পায় বনহুর। সত্যি সে আনমনা হয়ে পড়েছিলো, কারণ ঠিক এমনি সময় প্রতিদিন জংলী রাণীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে সেই হ্রদের ধারে। আজও হয়তো জংলীরাণীর প্রতিক্ষায় হ্রদের ধারে বসে বসে ভাবছে তার কথা। জংলী রাণী কথা বলতে পারেনা কিন্তু মনের ভাষা সে প্রকাশ করে তার দৃষ্টির মাধ্যমে। জংলী রাণীর কথা স্মরণ হতেই আনমনা হয়ে পড়েছিলো বনহুর। হুসনার কথায় একটু হেসে বলে—ভাবছি মৃগনাভি কস্তুরীর কথা। কথাটা বলে পুনরায় কাজে মনোযোগ দেয়ে বনহুর।

এক সময় মাছ ধরা শেষ হয় ফিরে চলে জেলেরা। নৌকাগুলো এগিয়ে চলেছে।

আজ ওরা অনেক মাছ পেয়েছে।

আনন্দ ওদের ধরছেনা।

চুমকী আর হুসনা বসে আছে। বনহুর আর রাজু নৌকা বাইছে।

আজ জেলেরা বহুদূর এসে পড়েছিলো তাই ফিরতে বিলম্ব হচ্ছে। অনেক ঘুরে ফিরে নৌকা চলেছে।

একটা জঙ্গলের ধার বেয়ে যখন নৌকাগুলো এগুচ্ছিলো ঠিক্ ঐ মুহূর্তে একটা তীর এসে বিদ্ধ হলো রাজুর বুকে।

সঙ্গে সঙ্গে রাজু আর্তনাদ করে বৈঠা ছেড়ে নৌকার মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো।

বনহুর অমনি ধরে ফেললো রাজুকে।

চুমকী স্বামীকে মুখ থুবড়ে পড়তে দেখে হাঁউমাঁউ করে কেঁদে উঠলো।

হুসনাও যেন কেমন হয়ে গেলো।

একদন্ডে জেলে নৌকাগুলো এক জায়গায় জড়ো হয়ে পড়েছে। সবার মুখে চোখে ফুটে উঠেছে আতঙ্কের ছায়া। সবাই হায় হায় করে উঠলো, চুমকী তো বিলাপ করে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে।

বনহুর রাজুকে চীৎ করে শুইয়ে দেয় নৌকার মধ্যে তারপর তীরটা ওর বুক থেকে টেনে তুলে ফেলে।

জেলে বাবা বলে উঠে—জংলী রাণীর বিষাক্ত তীর এটা......

সবার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

বনহুরের মুখ মন্ডলে একটা গভীর দুঃচিন্তার ছাপ পড়ে। ভ্রু কুঞ্চিত হয় তার।

চুমকী মাথা আছড়ে কাঁদছে।

স্বামীকে ও বড় ভালবাসতো।

জেলেবাবা বললো—রাজুকে বাঁচাতে পারলাম না বাবু। রাজুর বুকে তীর গেঁথে গেছে। হাতে কিংবা শরীরের অন্য কোন জায়গায় তীর গেঁথে গেলে বাঁচানো যেতো।

একটু পূর্বে জেলে নৌকাগুলোতে আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছিলো, এখন শোকে, কান্নায় গুঁমড়ে উঠে সবাই।

জেলে বাবা বলে উঠলো—বাবু জংলী রাণী বড় হবার পর থেকে জেলে পাড়ার অনেক লোকের অবস্থা রাজুর মত হয়েছে। দু'চারজনকে আমি বাঁচাতে পেরেছি আর সবগুলো মরেছে......বাষ্পরুদ্ধ জয়ে আসে তার গলা। একটু থেমে বলে—বাবু আমার কোন ছেলেমেয়ে নাই তাই জেলে পাড়ার সবাই আমার ছেলেমেয়ে......আবার সে ডুকরে কেঁদে উঠে।

ওদিকে চুমকীর কান্নায় সমুদ্র বুকে কেঁপে কেঁপে উঠছিলো যেন।

হুসনাও বার বার চোখ মুছছিলো।

বনহুর বললো—রাজু শেষ হয়ে গেছে জেলে বাবা। চলো ফিরে চলো।

জেলে বাবা নাও ছাড়বার নির্দেশ দেয়।

তীর বুকে বিদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েক মিনিটের মধ্যে রাজু প্রাণ ত্যাগ করেছিলো।

নৌকাগুলো সারিবদ্ধ হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

নৌকায় জেলেরা বিষণ্ন মনে বসে আছে। প্রত্যেকটা নৌকায় দু'জন জেলে দাঁড় টানছে। দাঁড়ের শব্দ হচ্ছে ঝুপঝাপ্-ঝুপঝাপ।

চুমকীর কান্নার শব্দ আর দাঁড় টানার শব্দ মিলে অদ্ভুত শোনাচ্ছিলো।

বনহুর নীরব নিস্পন্দ ভাবে বসে আছে।

তারই সম্মুখে পাটাতনের উপর চীৎ হয়ে পড়ে আছে রাজুর প্রাণহীন দেহটা।

বনহুরের মুখোভাব কঠিন, ভাবছে জংলী রাণীর এই নির্মম আচরণ কত নিশৃংস। জংলী রাণীকে সে মানুষ রূপে তৈরি করার চেষ্টা করে চলেছে কিন্তু কতখানি তার চেষ্টা সার্থক হবে কে জানে। জংলী রাণীর উপর বনহুরের ভীষণ একটা রাগ মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠে। তীর ছুড়ে মানুষ হত্যা করে কি আনন্দ পায় সে।

জেলে পাড়ায় পৌছুতে বেশ রাত হয়। যারা মাছ ধরতে যায়নি তারা রাজুর নিহত হবার কথা শুনে সবাই ছুটে এলো। চুমকী মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগলো।

সবাই চুমকীকে সান্তনা দেবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছে। কিছুতেই সে প্রবোধ মানছে না। স্বামীই যে ছিলো ওর সবচেয়ে প্রিয়।

রাজুর সৎ কাজ করতে রাত গভীর হয়ে এলো।

অনেক রাতে বনহুর যখন ফিরে এলো তার কুঠিরে তখন হুসনাও ঘুমাতে পারেনি। বসেছিলো সে বিষণ্ন মনে।

পাড়ার কোন এক কুঠির থেকে ভেসে আসছিলো চুমকীর কাঁন্নার শব্দ।

বনহুর ম্লান মুখে খাটিয়ায় এসে বসলো।

হুসনা বললো—কি সাংঘাতিক—কি নিষ্ঠুর এই জংলী রাণী...... চুমকির সব আশা সে নিঃশেষ করে দিলো।

হাঁ মিস হুসনা। তীরটা যদি রাজুর বুকে বিদ্ধ না হয়ে আমার বুকে হতো তবু চুমকীর এমন সর্বনাশ হতো না।

হুসনা আঁতকে উঠলো, সে ছুটে এলো বনহুরের খাটিয়ার পাশে। বনহুরের মাথায় হাত বুলিয়ে বললো—না না অমন কথা মুখে আনবেন না মিঃ চৌধুরী। আপনাকে হারালে আমি বাঁচবো না......

কিন্তু চুমকী কি করে বাঁচবে মিস হুসনা?

হুসনা কোন জবাব দিতে পারে না।

❑

জংলী রাণী ছুটে এসে বনহুরের দিকে একটা ফুল বাড়িয়ে ধরে বললো—নাও।

বনহুর মুখ গম্ভীর করে দাঁড়িয়েছিলো, সে ফুল নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিলো।

জংলী রাণী প্রথমে একটু আশ্চর্য হলো তারপর সে দ্রুত হাতে ফুলটা কুড়িয়ে নিয়ে পুনরায় বনহুরের সম্মুখে ধরে বললো—নাও?

এবার বনহুর ফুলটা নিলো তারপর ছিঁড়ে ফেললো টুকরা টুকরা করে।

জংলী রাণী অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো।

বনহুর তীর ধনুটা জংলী রাণীর হাতে গুঁজে দিয়ে বুক পেতে দাঁড়িয়ে ইংগিৎ করলো—মারো! আমার বুকে তীর মার জংলী রাণী......

জংলী রাণী প্রথমে হতভম্ব হলেও পরপরই সে বুঝতে পারলো তার বুকে তীর বসিয়ে দিতে বলছে। জংলী রাণী তীর ছুড়ে ফেলে দিয়ে বনহুরের বুকে মাথা রাখলো। সে কথা বলতে পারে না, মনের ভাষা দিয়ে সে বোঝাতে চেষ্টা করলো তোমার বুকে তীর মারবে না।

বনহুর ওকে ক্ষমা না করে পারলো না।

এরপর থেকে বনহুর ওকে কথা শেখাতে শুরু করলো। নাও বসো, চলো, খাও, দাও সব শিখলো জংলী রাণী।

রাজুকে নিহত করার জন্য জংলী রাণীর উপর বনহুরের যে রাগ ছিলো ধীরে ধীরে তা কমে এলো। জংলী রাণী যে সম্পূর্ণ অজ্ঞ একটা শিশুর মতই সরল তা বুঝতে বাকি ছিলো না বনহুরের।

চুমকীর-চোখের পানি তাকে অস্থির করে তুলতো, তখন যত রাগ ক্ষোভ-হতো জংলী রাণীর উপর। কিন্তু যখন সে জংলী রাণীর পাশে যেতো ওর সরল সচ্ছ ভাবধারা তাকে অভিভূত করতো, ভুলে যেতো বনহুর সব অভিমান।

জংলী রাণী অল্প কিছুদিনের মধ্যে অনেক কথা শিখলো। বুঝতে শিখলো সে অনেক কিছু। অবশ্য সবের পিছনে ছিলো বনহুরের অক্লান্ত প্রচেষ্টা।

বনহুর চায় জংলী রাণীর তীর ধনু আর যেন জেলেপাড়ার কোন নিরীহ জেলের বক্ষ ভেদ না করে। সেই কারণেই বনহুর জংলী রাণীর জন্য অনেক কষ্ট করতে লাগলো।

একদিন বনহুর লক্ষ্য করলো জংলী রাণীর মধ্যে বিরাট একটা পরিবর্তন। আনন্দ আর বিস্ময়ে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো— সাবাস!

জংলী রাণী লতা গাছের চওড়া ছাল দিয়ে নিজের বক্ষ বেষ্টনী তৈরি করে নিয়েছে। বনহুর এটা লক্ষ্য করে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠে বলে সে—জংলী রাণী তোমার মধ্যে লজ্জা জন্ম নিয়েছে দেখে খুশি হলাম......প্রচেষ্টা আমার সার্থক হয়েছে......

জংলী রাণী বনহুরের কথাগুলো বুঝতে না পারলেও এটুকু বুঝতে পারলো—বনহুর খুব খুশি হয়েছে। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে জংলী রাণী তার মুখের দিকে।

বনহুরের মনে আজ সীমাহীন আনন্দ—জংলী রাণী বুঝতে শিখেছে, জানতে শিখেছে, অনুভূতি এসেছে তার মধ্যে।

বনহুরকে অবাক চোখে চেয়ে থাকতে দেখে জংলী রাণী বলে—তুমি ভাল......তুমি সুন্দর,......

বনহুর ওর হাত দু'খানা এটে ধরে বলে—বলো, বলো জংলী রাণী আবার বলো—তুমি ভাল—তুমি সুন্দর—তুমি সুন্দর......

ঠিক ঐ মুহূর্তে একটি জংলী হঠাৎ সেই জায়গায় এসে পড়ে। জংলী রাণীকে একটা লোককে সঙ্গে দেখে রাগে ফুলে উঠে সে। সঙ্গে সঙ্গে মুখে হাত দিয়ে চিৎকার করে উঠে।

জংলী রাণীর চোখ দুটো জ্বলে উঠে আগুনের বলের মত, সে দ্রুত হাতে তুলে নেয় কিছুক্ষণ পূর্বে ফেলে দেওয়া তীর ধনু তারপর সেই জংলীকে লক্ষ্য করে তীর ছোড়ে।

এক সেকেন্ড মাত্র।

তীর গিয়ে বিদ্ধ হয় জংলীটার পিঠে। অমনি সে উবু হয়ে পড়ে যায় মাটিতে। কাটা ছাগলের মত ছট্ ফট্ করতে থাকে জংলীটা।

জংলী রাণী বলে উঠে—এসো—বাবু—এসো—পা—লা—এ—সো—

কিন্তু বনহুর তখন জংলী রাণীকে কথা বলতে দেখে অবাক হয়ে গেছে, আনন্দের বন্যা বয়ে চলেছে তার মনে, ভুলে গেছে সব কথা।

জংলী রাণী বনহুরের হাত ধরে টেনে নিয়ে যায়, কিন্তু কয়েক পা না যেতেই চারিদিক থেকে জংলীরা এসে ঘিরে ধরে।

জংলী রাণীকে দেখে সবাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। জংলী রাণী তীর ধনু উঁচু করে ধরে অদ্ভুত ধরণের শব্দ করে উঠে।

অমনি জংলী সর্দার হাত তুলে এক ধরণের আওয়াজ করলো, সঙ্গে সঙ্গে জংলীরা তীর ধনু নামিয়ে নিলো। কিন্তু এবার জংলী সর্দার এগিয়ে এলো।

বনহুর অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে।

জংলীটা এগিয়ে এসে বনহুরের দিকে হাত বাড়ালো। তার পিছনে অভিজ্ঞ সৈন্যদলের মত দাঁড়ালো জংলীদল।

বনহুর বুঝতে পারলো জংলী সর্দার তার সঙ্গে সন্ধি করতে চাচ্ছে। বনহুরও হাত বাড়িয়ে কর মর্দন করলো জংলী সর্দারের সঙ্গে যেমন করে সভ্য সমাজে হ্যান্ডসেক করা হয়ে থাকে তেমনি করে।

জংলী রাণীর দিকে তাকালো বনহুর।

জংলীরাণী বললো—চলো—এ—আ—মা—র—বা—বা—

বনহুর বললো—আজ থাক। কাল আবার আসবো।

জংলী রাণী বললো—যা—ও—আ—বা—র—আ—স—বে—তুমি.....

আসবো। বনহুর চলে যায়।

জংলী রাণী তার জংলী পিতার সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকে।

বনহুর দৃষ্টির আড়ালে যেতেই জংলী রাণী নিহত জংলীটাকে দেখিয়ে কিছু উচ্চারণ করে।

জংলী সর্দার তার দলবলকে ইংগিৎ করে।

নিহত জংলীর লাশটা দু'জন জংলী তুলে নেয় কাঁধে।

তারপর ওরা ফিরে চলে আস্তানায়।

বনহুর আজ আনন্দিত, তার সাধনা সার্থক হয়েছে। জংলী রাণী অনেকটা মানুষে পরিণত হয়েছে, তার মধ্যে এসেছে লজ্জা দ্বিধা সঙ্কোচ। কথা সে সব বলতে বা বুঝতে না পারলেও অনেক কথাই সে বলতে পারে বুঝতেও পারে।

আজকের ঘটনাটা বনহুরকে বেশি করে ভাবিয়ে তুলেছিলো। জংলী রাণী আপন ইচ্ছায় তার বক্ষ বেষ্টনী তৈরি করে নিয়েছে। চোখে মুখে তার একটা অনুভূতির আভাস দেখেছে আজ বনহুর। জংলীটাকে সে হত্যা করলো তারই জন্য। জংলীদের কাছেও তাকে বাঁচিয়ে নিলো অদ্ভুত উপায়ে।

বনহুর খাটিয়ায় শুয়ে শুয়ে ভাবছে এমন সময় হুসনা এসে দাঁড়ায় তার পাশে, বলে—কি ভাবছেন মিঃ চৌধুরী?

বনহুর একটু হেসে বলে—নতুন কিছু নয়?

মৃগ নাভির সন্ধান পেলেন?

হাঁ মিস হুসনা মৃগনাভি কস্তুরীর সন্ধান পেয়েছি।

সত্যি?

হাঁ।

তাহলে......—

আমার প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে।

কিন্তু কোথায় সে মৃগনাভি কস্তুরী?

জঙ্গলে।

জঙ্গলে?

হাঁ।

আমাকে দেখাবে না মিঃ চৌধুরী?

নিশ্চয়ই।

কবে? কখন?

যখন সময় আসবে তখন।

হুসনা বনহুরের কথায় সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হতে পারেনা সে চলে যাচ্ছিলো।

বনহুর বলে—মিস হুসনা বসুন।

হুসনা একটু অবাক হয় কারণ মিঃ চৌধুরী কোনদিন তাকে নিজের বিছানায় বসার জন্য এমন করে বলেনি। হুসনা তাই ফেলতে পারেনা মিঃ চৌধুরীর কথাটা।

বসে বনহুরের পাশে।

বনহুর বলে—মিস হুসনা রোজ জঙ্গলে যাই বলে আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট তাই না?

না।

মিথ্যে কথা।

কেনো আমি অসন্তুষ্ট হবো বলুন? আপনি তো আমার আপন জন নন যে আপনাকে আমি ধরে রাখতে পারবো। হুসনার কথাগুলোতে একরাশ অভিমান ঝরে পড়লো।

বনহুর বললো—কি বললেন আপনি আমার আপনজন নন? মিস হুসনা এই অজানা অচেনা দ্বীপে আমি আর আপনি, আপনি আর আমি এ ছাড়া কেইবা আমাদের কাছে। জেলে বাবা এবং অন্যান্য জেলেরা আমাদের যথেষ্ট স্নেহ করে, যথেষ্ট ভালবাসে তবু আমাদের মন তৃপ্ত নয় কারণ আমরা দেশে ফিরে যাবার জন্য সদা উন্মুখ। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে বনহুর—মিস হুসনা জানিনা কোন দিন আর দেশে ফিরে যেতে পারবো কিনা।

হুসনার মনটাও আনমনা হয়ে উঠে।

বনহুর বলে—প্রায় বছর হয়ে এলো আমার এ দ্বীপে এসেছি মিস হুসনা। বাড়িতে আপনার বাবা মা আত্নীয় স্বজন হয়তো আপনাকে খুঁজে খুঁজে হতাশ হয়ে পড়েছেন। আমার আত্নীয় স্বজনের মধ্যেও নিশ্চয়ই হতাশা এসেছে। সবার কাছে এখন আমরা মৃত। যদি কোন দিন ফিরে যেতে পারি তবেই আবার আমরা নতুন জীবন লাভ করবো। একটু থেমে বলে বনহুর—এখন কুন্দল দ্বীপের বাসিন্দা আমরা। বলুন তাই নয় কি? একথা আপনি কিংবা আমি কেউ অস্বীকার করতে পারবো না। জেলেবাবা এবং তার দলবল সবাই আমাদের হিতাকাঙ্খী। শুধু হিতাকাঙ্খী-ই নয় ওরা আমাদের জীবন রক্ষক। মিস হুসনা আমাদের জন্য এরা যেমন ত্যাগ এবং কষ্ট স্বীকার করেছে—তেমনি আমাদেরও কর্তব্য আছে ওদের জন্য।

হুসনা নির্বাক শুনে যাচ্ছিলো, বনহুরের কথাগুলো।

বনহুর বলে চলেছে—জংলীদের অত্যাচারে এরা অতিষ্ঠ। সেদিন রাজুর মৃত্যু তার একটি জীবন্ত প্রমাণ। রাজুর মত আরও বহু জেলেকে প্রাণ দিতে হয়েছে। হয়তো আরও হবে......মিস হুসনা আমার প্রচেষ্টা আর যেন জংলীদের অত্যাচারে জেলেরা নিষ্পেষিত না হয়। অকালে রাজুর মত আর যেন কেউ প্রাণ না হারায়। চুকমীর মত আর যেন কারো কপাল না ভাঙ্গে। মিস হুসনা আমি জঙ্গলে যাই সেই কারণে। জেলে এবং জংলীদের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন গড়ে তুলতে চাই।

দু'চোখ কপালে তুলে বলে হুসনা—মিঃ চৌধুরী আপনি কি বলছেন? জংলী এবং জেলেদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে চান?

হাঁ মিস হুসনা।

কিন্তু এও কি সম্ভব?

অসম্ভব এ পৃথিবীতে কিছুই নয়।

জংলীরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ! তারা মানুষ নামে পশু।

মিস হুসনা আপনি জানেন হিংস্র ব্যাঘ্র এবং পশুরাজ সিংহকেও মানুষ বশ মানায়। আর জংলীরা মানুষ......

আপনি তাহলে মৃগনাভির সন্ধানে হরিণের খোঁজে যান না? যান জংলীদের বশ করতে?

হাঁ মিস হুসনা।

কি ভয়ঙ্কর মানুষ আপনি।

যতটুকু আপনি ভাবছেন তার চেয়েও আমি ভয়ঙ্কর কাজে লিপ্ত আছি। জংলী রাণীকে আমি মানুষ করতে চাই...

জংলী রাণীকে মানুষ করতে চান! হুসনার মুখ বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠে!

বনহুর বলে—হ্যাঁ।

হুসনা ঢোক গিলে বলে—জংলী রাণী সে যে আরও ভয়ঙ্কর।

মিস হুসনা আমি তার চেয়েও ভয়ঙ্কর। অট্টহাসিতে ভেংগে পড়ে বনহুর।

হুসনার চোখে মুখে ফুটে উঠে বিস্ময়, নির্বাক নয়নে তাকিয়ে থাকে সে বনহুরের দিকে।.

বনহুর হাসি থামিয়ে বলে—আমি জংলী রাণীকে মানুষে পরিণত করার সাধনায় লিপ্ত ছিলাম এতোদিন। মিস হুসনা—আপনাকে না জানিয়ে এবং জেলে বাবা ও তার দলবলের কাছে গোপন করে আমি রোজ জঙ্গলে গেছি। কেন গেছি আপনারা কেউ জানেন না। শপথ করেছিলাম যতদিন আমার প্রচেষ্টা সার্থক না হবে ততদিন আমি এ কথা কাউকে বলবোনা।

মিঃ চৌধুরী।

হাঁ আমার সাধনা সার্থক হয়েছে মিস হুসনা। জংলী রাণী কথা বলতে শিখেছে। তার মধ্যে এসেছে মনুষ্যত্ববোধের অনুভূতি।

আপনি জংলী রাণীর সম্মুখে—মানে তার সামনে গিয়েছিলেন?

হাঁ মিস হুসনা।

জংলী রাণী আমাকে হত্যা করেনি?

হেসে বলে বনহুর—করেনি বলেইতো আজ আপনার সম্মুখে বসে কথা বলছি।

হুসনার মুখ ভাবে বিস্ময় ফুটে, বলে সে—জংলী রাণী কেমন মিঃ চৌধুরী?

জঙ্গলের জীব জন্তুর মত।

হুসনার ভ্রুকুঞ্চিত হয়ে উঠে, বলে—জঙ্গলের জীব জন্তুর মত?

কতকটা তাই। তবে এখন সে অনেকটা মানুষের মত হয়েছে। কথা বলতে পারতোনা, কথা সে বুঝতোনা, লজ্জা বলে তার কিছু ছিলো না। এখন সে একটু একটু কথা বলতে পারে একটু একটু বোঝে। লজ্জার অনুভূতিও জেগেছে তার মধ্যে।

সত্যি।

হাঁ।

আমাকে নিয়ে যাবেন জঙ্গলে?

তা হয়না, কারণ জঙ্গলে বিপদ ঘটতে পারে প্রতি মুহূর্তে।

তবে আপনি যান?

আমি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্য প্রস্তুত হয়েই গিয়েছি এবং যাই। যে কোন মুহূর্তে আমার মৃত্যু ঘটতে পারে।

মিঃ চৌধুরী...

ভয় নেই এখন আমার জীবন থেকে বিপদগুলো ধীরে ধীরে সরে গেছে হয়তো আর কোন বিপদ উপস্থিত দেখা দেবে না।

সেদিন বনহুর আর হুসনার অনেক কথা হলো।

নিজেদের সম্বন্ধে। জেলেদের নিয়ে। জংলী রাণী ও জংলীদের ভবিষ্যত নিয়ে।

বনহুর সেদিনও বুঝতে পারেনি জংলী রাণী তাকে কতখানি ভাল বেসে ফেলেছিলো।

জংলীরাণীর ভালবাসা ছিলো পবিত্রতায় ভরা।

একটি জংলী ফুলের মতই জংলী রাণী নির্মল নিষ্পাপ।

পরদিন জংলী রাণী প্রতীক্ষা করছে তার বাবুর জন্য। বাবুকে না দেখলে সে যেন এক মুহূর্ত থাকতে পারে না। যে বাবুকে সে একদিন নৃশংসভাবে হত্যা করতে গিয়েছিলো এখন সেই বাবুই যেন তার সবকিছু।

বনহুরকে ধরে বসলো হুসনা জংলী রাণীকে একদিন দেখবো।

বনহুর বললো—নিশ্চয়ই দেখাবো আর কয়েকদিন বিলম্ব করুন।

হুসনা অধির আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলো জংলী রাণীকে দেখবে সে।

বনহুর এবার যখন জংলী রাণীর কাছে এসে পৌঁছলো তখন জংলী রাণী পূর্বের চেয়ে আরও উচ্ছল আনন্দ মুখর হয়ে উঠেছে। বনহুরকে দেখবা মাত্র ছুটে এসে দু'হাতে ওর গলা জড়িয়ে ধরে বা-বু-তু-মি-এ-সে ছো—একটা জংলী ফুল তুলে নিয়ে বলে—না-ও।

বনহুর ফুলটা নিয়ে গুঁজে দেয় জংলী রাণীর চুলের মধ্যে।

জংলী রাণী হাসে।

বনহুর ওর চিবুকটা তুলে ধরে বলে—খুব সুন্দর তুমি...

জংলী রাণী উচ্চারণ কারে খু-ব-সু-ন্দ-র তু-মি...

বলো—আবার বলো—বলো জংলী রাণী।

জংলীরাণী বলে—ব—লো—আ—বা—র—ব—লো—জং—লী—রা—নী— বলেই খিল খিল করে হেসে উঠে জংলীরাণী।

বনহুর নিজের বুকে আংগুল রেখে বলে—আমি বাবু আর তুমি,—জংলী রাণীর বুকে আংগুল রেখে বলে—তুমি জংলীরাণী।

জংলী রাণী হাসতে হাসতে বলে—আ—মি—বা—বু...

বনহুর বলে উঠে—না, তুমি জংলী রাণী আর আমি বাবু।

জংলী রাণী বার বার ভুল করে বনহুর ওকে শেখায়?।

সম্মুখের গাছ আংগুল দিয়ে দেখিয়ে বলে বনহুর—গাছ...

জংলী রাণী উচ্চারণ করে—গা—ছ—

একটা ফুল তুলে নিয়ে জংলীরাণীর দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে— ফুল...

জংলী রাণী বলে উঠে—নাও!

নাও নয়, ফুল—এটার নাম ফুল।

ফু—ল!

হাঁ—বলো ফুল...

ফুল—ফু—ল...

একটা পাথর তুলে নিয়ে বলে বনহুর—এটা পাথর। বলো এটা কি?

পা—থ—র—

হ্রদের ধারে এসে দাঁড়ায় দু'জনা।

বনহুর বলে—এইটা কি বলো তো জংলী রাণী?

জংলী রাণী শুধু হাসতে থাকে।

বনহুর ওর চিবুকে মৃদু চাপ দিয়ে বলে—হ্রদ...এটা হ্রদ..

জংলী রাণীর মুখে হ্রদ শব্দটা উচ্চারিত হয় না। সে এক ধরনের শব্দ করে—হদ, এটা হদ...

না বলো হ্রদ।

বার বার বলে বনহুর।

জংলীরাণী ওকে হঠাৎ পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় হ্রদের জলে।

বনহুর জলে পড়ে যেতেই জংলী রাণী খিল খিল করে হেসে উঠে। সে হাসি আর যেন থামতে জানে না।

বনহুর মিছামিছি ডুবে যাবার ভান করে হাত বাড়ায় জংলীরাণীর দিকে।

জংলীরাণীও হাত এগিয়ে দেয়।

বনহুর ওর হাত খানা ধরে টেনে দেয় হ্রদের জলে।

বলে বনহুর এবার কেমন মজা হলো তো।

জংলী রাণীর আনন্দ আর ধরে না।

জংলী রাণী আর বনহুর সাঁতার কাটে হ্রদের জলে। জংলী রাণী বার বার জল নিয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছিলো বনহুরের চোখে মুখে। বনহুর ভুলে যায় মুহূর্তের জন্য সব কিছু, সেও জল নিয়ে ছিটিয়ে দেয় জংলী রাণীর দিকে।

জংলী রাণীর উচ্ছল হাসির শব্দে মুখর হয়ে উঠে হ্রদের ধার।

জন শূন্য হ্রদের জলে দুটি প্রাণী আনন্দে আত্মহারা। জংলী রাণীর সঙ্গ বনহুরকে অভিভূত করে ফেলেছে। সাঁতার কাটছে ওরা মনের উচ্ছাসে।

জংলী রাণী সাঁতরে চলে যায় দূরে। হাত দিয়ে ডাকে সে বনহুরকে—এ—সো—

বনহুর সাঁতার কেটে এগিয়ে যায়।

জংলী রাণী ধরা দেয়না, খিল খিল কারে হাসে আর দু'হাতে জল ছিটিয়ে দেয়।

বনহুরের মুখে চোখে ঝাপটা লাগে।

এক সময় বনহুর ওকে ধরে ফেলে।

জংলী রাণী কছুতেই বনহুরের বলিষ্ঠ বাহু থেকে নিজকে ছাড়িয়ে নিতে পারে না।

ঢেউগুলো ছুটে এসে আছড়ে পড়ে তাদের শরীরে।

বনহুর বলে—আর জল দেবে জংলী রাণী....বলো দেবোনা—বলো —দেবোনা—

দেবোনা—দে—বো—না—

বলো ছেড়ে দাও।

ছে—ড়ে—দা—ও...

বলো ক্ষমা করো।

ক্ষ—মা—ক—রো...

বনহুর ওকে মুক্ত করে দেয়, বলে—চলো এবার উঠা যাক।

জংলী রাণী বলে—চ—লো....

বনহুর আর জংলী রাণী সাঁতার কেটে এগিয়ে চলে।হ্রদের ধারে এসে বনহুর উঠে পড়ে হাত বাড়ায়—এসো।

জংলী রাণী বনহুরের হাত ধরে উঠে আসে।

এমন সময় জংলী সর্দার বর্শা হাতে এসে দাঁড়ায় সেখানে।

বনহুর চমকে উঠে।

জংলী রাণী পিতাকে লক্ষ্য করে কিছু বলে।

জংলী সর্দার সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়ায় বনহুরের দিকে।

বনহুর খুশিতে দীপ্ত হয়ে হাত মিলায় জংলী সর্দারের সঙ্গে।

জংলী রাণী বলে—বা—বু—জঙ্গলে—চা—লো—বা—বো—তো—মা—কে— যে—তে—ব—লে—

বনহুর সম্মতি জানায়।

জংলী রাণী আর বনহুর জংলী সর্দারের সঙ্গে আস্তানায় যায়।

জংলীরা বনহুরকে দেখে প্রথম দিন যেমন খাপ্পা হয়ে উঠেছিলো। আজ আর তেমন খাপ্পা হলো না। সবাই সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালো।

জংলী রাণী কিছু বললো।

সঙ্গে সঙ্গে জংলী নারী পুরুষ সবাই বনহুরকে মাথা নীচু করে অভিবাদন জানালো।

জংলী রাণী অনেকগুলো ফল এনে রাখলো বনহুরের সম্মুখে।

বনহুর চুপ করে রইলো।

যতক্ষণ না জংলী রাণী বলবে খাও, ততক্ষণ বনহুর ঐ ফল খাবে না।

জংলী রাণী একটা ফল তুলে নিয়ে বনহুরের হাতে দিলো তারপর বললো—বা—বু—খা—ও—

বনহুর ফলটা এবার খেতে শুরু করলো।

এক সময় ফিরে এলো বনহুর জংলীদের কাছে বিদায় নিয়ে। এরপর থেকে বনহুর প্রায়ই জংগলে গিয়ে জংলীদের মধ্যে মনুষ্যত্ব বোধ জাগানোর চেষ্টা চালাতে লাগলো।

জংলীরা যেমন ছিলো ভয়ঙ্কর হিংস্র তেমনি ওরা সরল সহজ, নির্বোধ বলা চলে ওদের। এরপর থেকে বনহুর জংলীদের সভ্য করে তোলার চেষ্টা চালায়। জংলী সর্দার বশ্যতা স্বীকার করার ব্যাপারটা কিছু সহজ হলো বনহুরের কাছে।

❑

ছ'মাস এক বছর কেটে গেলো কুন্দল দ্বীপে বনহুর আর হুসনার। জেলেদের সঙ্গে গভীর একটা সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে তাদের। যেন ওরা কত দিনের আপন জন।

বনহুর একদিন জংলী সর্দারকে নিয়ে আসে জেলেদের মধ্যে। এখন জংলী সর্দার অনেকটা সভ্য হয়েছে। শুধু জংলী সর্দার নয় তার দলবল সবাই বনহুরকে সমীহ করতে শিখেছে। অবশ্য জংলী রাণীর জন্যই এতোটা সম্ভব হয়েছে বনহুরের।

জংলীরা একেবারে অসভ্য ছিলো তাদের মধ্যে মনুষত্ববোধ জাগাতে বনহুরকে বহু সাধনা করতে হয়েছে। হিংস্র জীবজন্তুকে পোষ মানানো সহজ তবু হিংস্র মানুষকে সভ্য মানুষে পরিণত করা সহজ নয়।

জংলী রাণীর সহায়তা না পেলে হয়তো এতোটা সম্ভব ছিলো না।

জংলী রাণী যখন আধো আধো কথা বলতে শিখলো, তখন বনহুর তার দ্বারায় জংলীদেরও একটু আধটু কথা বলা শেখাতে শুরু করেছিলো। বনহুর জীবনের মায়া বিসর্জন দিয়েছিলো কতকটা। কারণ যে কোন মুহূর্তে জংলীরা তাকে হত্যা করতে পারে।

বনহুর যেদিন জংলী সর্দারকে জেলে পাড়ায় নিয়ে এলো সেদিন জংলী সর্দারকে দেখে অত্যন্ত নিরীহ জন বলেই মনে হচ্ছিলো। কারণ জংলী সর্দার এসে জেলেদের সঙ্গে হেসে করমর্দন করেছিলো। যদিও সে এখনও তেমন কোন কথা বলতে পারে না তবু দু'একটা কথা বলতে চেষ্টা করেছিলো।

জংলীদের সঙ্গে একটা মিতালী ভাব গড়ে উঠেলো সেদিনের পর থেকে।

জেলে বাবা আর জংলী সর্দার মিলে বুকে বুক মিলালো এরপর থেকে গড়ে উঠলো এক বন্ধুত্ব ভাব।

বনহুরের প্রচেষ্টা সার্থক হলো।

জংলীদের ভয়ে সদা সর্বদা জেলেরা আতঙ্কগ্রস্ত থাকতো। কারণ প্রায়ই জংলীরা আক্রমণ চালাতো জেলেদের উপর। নির্মমভাবে হত্যা করতো নিরীহ জেলেগণকে।

বনহুর এটা লক্ষ্য করছিলো।

সে কুন্দল দ্বীপে আসার পর জংলীরা জেলেদের উপর ভয়ঙ্করভাবে আক্রমণ চালালেও জেলে বাবা এবং জেলেদের কাছে শুনেছে জংলীরা প্রায়ই তাদের উপর আক্রমণ চালায় এবং হত্যা করে নিরীহ জেলেদের। বনহুর সেদিনের পর থেকে মনে মনে চিন্তা করছিলো জংলীদের হাত থেকে নিরীহ জেলেদের রক্ষার কি উপায় আছে বা করা যায়।

এবার সে চিন্তার অবসান হলো।

জংলীরা সবাই না এলেও জংলীদের মধ্যে যারা সর্দার স্থানীয় এবং জংলী সর্দার নিজে প্রায়ই আসতে শুরু করলো।

জেলেরা প্রচুর মাছ দিতো আর জংলীরা দিতো হরিণ শিকার করে কিংবা ফলমূল। দু'জনের মধ্যে একটা মহান বন্ধুত্ব ভাব যেন চিরস্থায়ী হয় এ জন্য বনহুর জংলীদের নিয়ে জেলেদের মত মাছ ধরা শেখাতে লাগলো।

শুধু মাছ ধরা নয় সবাইকে যেন জেলেদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে মনে ভাব ধারা প্রকাশ করতে পারে সেজন্য বনহুর জংলীদের নিয়ে কথাবার্তা শেখাতে শুরু করলো।

দিন যায় রাত আসে।

সপ্তাহ গিয়ে মাস হয়।

মাস গিয়ে বছর হলো।

বনহুর জেলে আর জংলীদের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলতো তাতে সময় গুলো কোন দিক দিয়ে যে কেটে যাচ্ছিলো সে বুঝতেই পারলো না।

জংলী রাণীর সঙ্গে বনহুরকে এসব কারণে বেশি সময় কাটাতে হতো। জংলী রাণীও বনহুরকে কাছে না পেলে চঞ্চল হয়ে উঠতো ক্ষিপ্তের মত।

জংলী রাণী এমন হবে এ কথা বনহুর ভাবতে পারেনি প্রথমে, পরে বুঝতে পারে জংলী রাণী তাকে অক্টপাশের মত ঘিরে রাখতে চায়।

জংলী রাণী এখন বেশ কথা বলতে শিখেছে। সে আজকাল তার দলের মেয়েদের বক্ষ বেষ্টনী তৈরি করে পরতে শিখিয়েছে। অনেকটা সভ্য হয়েছে এখন জংলী মেয়েরা।

বনহুর একদিন জংলী রাণীকে বললো—চলো আমি যেখানে থাকি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাবো—যাবে?

বললো জংলী রাণী—যা—বো।

বনহুর জংলী রাণীকে সঙ্গে করে একদিন নিয়ে চললো জঙ্গল ছেড়ে জেলে পাড়ার দিকে। জংলী রাণী কোনদিন প্রকাশ্য এ জেলে পাড়ায় আসেনি। সে ঝোপ ঝাড়ে আত্মগোপন করে কিংবা রাতের অন্ধকারে এ সব অঞ্চলে থাকতো তার সঙ্গে থাকতো বিষাক্ত তীর ধনুক।

ইচ্ছা মত তীর চালাতো। যাকে খুশি হত্যা করতো সে। হত্যার নেশায় মেতে উঠতো জংলী রাণী ক্ষিপ্তের মত।

জংলী রাণীসহ বনহুর যখন জেলে পাড়ায় এসে পৌছলো তখন জেলে নারী পুরুষ সবাই এসে ঘিরে ধরলো। তাদের মধ্যে ছিলো হুসনা।

হুসনা বসেছিলো তার কুঠিরের মধ্যে।

হঠাৎ ছমছম ছুটে এলো।

জেলেদের মেয়ে ছম ছম্ তের চৌদ্দ বছর বয়স! চঞ্চলা হরিণীর মত। সারাটা দিন এখানে সেখানে ঘুরে বোড়াতো, ইচ্ছা হলে মাছ ধরতো, ঝিনুক কুড়াতো। কখনও সাঁতার কাটতো সমুদ্রের হাটু জলে। ছমছম ছুটে এসে বললো—বৌ-রাণী বৌ-রাণী দেখবে এসো বাবুর সঙ্গে কে এসেছে—দেখবে এসো—

হুসনা ছমছমের সঙ্গে বেরিয়ে এলো কুটিরের বাইরে। দেখলো মিঃ চৌধুরী চারপাশ ঘিরে জেলে নারী পুরুষ ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। মিঃ চৌধুরীকে তেমন স্পষ্ট দেখা না গেলেও বোঝা যাচ্ছে তার জামার আস্তিন চেপে ধরে কেউ যেন দাঁড়িয়ে আছে।

হুসনা ভীড় ঠেলে এগিয়ে গেলো, সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো, দু'চোখে বিস্ময় ফুটে উঠলো তার, দেখলো একটি অর্দ্ধ উলঙ্গ নারী বাঘের ছাল পরিহিতা, গাছের ছালের বঘা বেষ্টনী, চুলগুলো বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে আছে কাঁধে পিঠে।

হুসনা এসে দাঁড়াতেই বনহুর বলে উঠলো—মিস হুসনা যাকে দেখতে চেয়ে এতোদিন প্রতিক্ষা করেছেন এই সেই জংলী রাণী।

বনহুর কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে জংলী রাণী বনহুরের বুকে মুখ লুকালো, কেমন যেন একটা ভীত ভাব নিয়ে তাকালো সে হুসনার দিকে।

হুসনার মুখ মন্ডল রাঙা হয়ে উঠলো, একটা দারুণ অভিমান ফুটে উঠলো তার চোখে মুখে। তীব্র দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইলো কয়েক মিনিট হুসনা বনহুর আর জংলী রাণীর মুখের দিকে তারপর সে দ্রুত চলে গেলো কুটিরের মধ্যে।

বনহুর বুঝতে পারলো হুসনা জংলী রাণীকে তার সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে মিশতে দেখে অভিমান করে চলে গেলো। কিন্তু এ মুহূর্তে জংলী রাণীকে ছেড়ে তার হুসনার কাছে যাওয়াও সম্ভব নয়। জংলী রাণী এদের মধ্যে এসে একেবারে কেমন যেন বিব্রত হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলো। ভীত সঙ্কোচিতভাবে তাকাচ্ছিলো সে ওদের দিকে।

জেলেবাবার আনন্দ যেন ধরছেনা, সে কি করবে ভেবেই পাচ্ছেনা যেন। তার চোখে মুখে রাশিকৃত বিস্ময় এই মেয়েটিকে সে একদিন একরত্তি কুড়িয়ে পেয়েছিলো সমুদ্রের বুকে ছোট্ট একটি বোট নৌকায় তার মৃত মায়ের পাশে। আশ্চর্য আজ সেই মেয়েটি কত বড় হয়েছে কত সুন্দর হয়েছে। জেলেবাবা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছে আজ।

বনহুর জেলে বাবার মুখোভাব লক্ষ্য করে মনে মনে সেও অসীম এক আনন্দ উপভোগ করে কারণ সে যা চেয়েছিলো আজ তা পূর্ণ হতে চলেছে।

শুধু জেলে বাবাই নয় জেলে নারী পুরুষ সবাই খুশি হয়েছে জংলী রাণীকে দেখে।

একদিন ঐ জংলী রাণী ছিলো তাদের আতঙ্ক। না জানি কোন মুহূর্তে সে কার প্রাণ সংহার করবে কে জানে। সদা সর্বদা একটা ভয় জেলেদের মনে দানা বেঁধে থাকতো।

জেলে নারী পুরুষ আজ আনন্দে আত্মহারাই শুধু নয় তারা বিস্মিত। সবাই অবাক চোখে জংলী রাণীকে দেখেছে।

জংলী রাণী কিন্তু এতোটা হকচকিয়ে যেতোনা যদি জেলে নারী পুরুষ তাকে এমন করে ঘিরে ধরে না দেখতো, হয়তো সেও ভয় পেয়ে গেছে। না জানি এরা তার দিকে অমন করে তাকিয়ে আছে কেনো।

জেলেরা জংলী রাণীকে যত দেখছে ততই যেন অবাক হচ্ছে কারণ তারা ভাবছে এই সেই জংলী রাণী যার ভয়ে তারা সর্বক্ষণ আতঙ্কগ্রস্ত থাকতো।

জংলী রাণী আরও বেশি করে নিজকে বনহুরের বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করছিলো। জড়ো সড়ো হয়ে গিয়েছিলো সে একেবারে।

বনহুর হেসে বললো—জংলী রাণী কোন ভয় নেই ওরা তোমাকে কিছু বলবে না।

জংলী রাণীর তবু যেন সঙ্কোচিত ভাব কাটে না। সে আরও নিবিড় হয়ে লুকোতে চায় বনহুরের বুকে। চাপা কণ্ঠে বলে জংলী রাণী—অ—মা—কে—নিয়ে চ—লো—বা—বু—

হাঁ তোমাকে নিয়ে যাবো। জংলী রাণী শোন—ঐ যে বৃদ্ধ জেলে বাবাকে দেখছো ও তোমার বাবা।

না না—আ—মা—র বা—বা—ও—না।

তুমি জানো না জংলী রাণী ঐ তোমার বাবা।

ত—বে—জ—ং—লী—সর্দার—আ—মা—র—কে?

সেও তোমার বাবা কিন্তু তোমার প্রথম রক্ষক এই বৃদ্ধ, এ তোমার পরম আপন জন। যাও জংলী রাণী যাও ওর কাছে যাও।

না—আ—মি—যা—বো—না......

জংলী রাণী আরও নিবিড় হয়ে যায় বনহুরের মধ্যে।

বনহুর নিজেও বেশ বিব্রত হয়ে উঠে কারণ জংলী রাণী একেবারে এতোটা জড়োসড়ো হবে এটা সে ভাবতে পারেনি।

জেলে বাবা নিজের হাতে দুধ আর ফল নিয়ে আসে। বনহুর আর জংলী রাণীর সম্মুখে রেখে বলে—বাবু ওকে খেতে দাও।

জংলী রাণী একটা ফল হাতে নিয়ে কাঁমড়ে খেতে যাচ্ছিলো।

ফলের ঝুড়ির পাশে চাকু ছিলো।

বনহুর চাকুটা তুলে নিলো হাতে তারপর একটা ফল নিয়ে বললো—এইভাবে খেতে হবে। ফলটা কেটে টুকরো টুকরো করে হাতে দিলো জংলী রাণীর—খাও।

জংলী রাণী খেতে শুরু করলো।

অল্পক্ষণেই অনেকটা হাল্কা হয়ে উঠে জংলী রাণী। স্বাভাবিক হয়ে আসে সে, আপন মনে খেতে খেতে সবাইকে ঘুরে ফিরে দেখতে থাকে।

হুসনার মন ব্যথা বেদনায় অভিমানে ভরে উঠেছে, কুটিরের মধ্যে বসে বসে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করে চলেছিলো। জংলী রাণী তার মিঃ চৌধুরীকে কেড়ে নিয়েছে। আর কোন দিন ফিরে পাবে না, এই রকম একটা ধারণা হুসনার সমস্ত হৃদয়টাকে অস্থির করে তুলেছিলো। হুসনার মনের পর্দায় একটির পর একটি স্মৃতির পরশ ভেসে উঠেছিলো। মিঃ চৌধুরী প্রথমে কেমন ছিলো তারপর ধীরে ধীরে কেমন হলো। যেদিন থেকে জঙ্গলে যাওয়া শুরু করেছিলো সেদিন থেকে মিঃ চৌধুরীকে প্রায় আনমনা হতে দেখেছে হুসনা।

মিঃ চৌধুরী কেনো এমন হলো। কেনো সে ঠিক আগের মত কথাবার্তা বলে না এটা ভাবিয়ে তুলেছিলো হুসনাকে। আজ সে আপন মনেই বলে

উঠলো—এবার সব বুঝতে পেরেছি কেনো মিঃ চৌধুরী এমন দূরে সরে পড়েছেন।

বনহুর জংলী রাণীর সঙ্গে থেকে তাকে কেমন করে খেতে হয় তা শিখিয়ে দিচ্ছিলো কিন্তু মনের ভিতরে একটা চিন্তা মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠছিলো সে হলো হুসনার কথা। নিশ্চয়ই সে কুটিরে গিয়ে খাটিয়ায় পড়ে কাঁদছে। হয়তো তাকে ভুল বুঝেছে সে।

কিন্তু জংলী রাণীকে ছেড়ে বনহুর সরতে পারছিলো না। কারণ সর্বক্ষণ অকে আঁকড়ে ধরে ছিলো সে, এক মুহূর্ত সরে যেতে দিচ্ছিলোনা।

বনহুর জংলী রাণীকে দুধের বাটি তুলে দেয়—খাও।

জংলী রাণী সব দুধ ঢেলে দেয় নিজের মাথায়।

জেলে পুরুষ ও মেয়েরা হেসে উঠলো এক সঙ্গে খিল খিল করে।

জংলী রাণী তো অবাক, রাগও হলো ওর, ওদের হাসতে দেখে ক্ষেপে গেলো ভীষণভাবে। দূরে শূন্য বাটিটা ছুড়ে মারলো সে জেলেদের লক্ষ্য করে।

ভাগ্যিস বাটিটা লাগলোনা কারো গায়ে, ঠিকরে গিয়ে পড়লো কিছুটা দূরে। পরক্ষণেই এক একটা ফল তুলে নিয়ে ছুড়ে মারতে লাগলো উন্মাদিনীর মত।

বনহুর ব্যস্ত কণ্ঠে বলে উঠলো—একি করছো জংলী রাণী? একি করছো?

তবু জংলী রাণী ফল তুলে নিয়ে ছুড়ে মারছে।

বনহুর ওর হাত দু'খানা চেপে ধরলো। জংলী রাণী একচুলও হাত দু'খানা নড়াতে পাড়লো না। এবার জংলী রাণী কামড়ে দিলো বনহুরের হাতের পিঠে।

বনহুর হাত ছেড়ে দিতেই জংলী রাণী দৌড়ে গিয়ে একটা জেলে বৌকে ধরে ফেললো এটে। চুল ছিড়তে শুরু করে দিলো তার, কারণ জেলে বৌটা একটু হেঁসে ছিলো জংলী রাণীর কাজ দেখে।

বনহুর দৌড়ে গিয়ে ধরে ফেললো তারপর সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড একটা বড় বসিয়ে দিলো জংলী রাণীর গালে?

জংলীরাণীর গালটা মুহূর্তে লালে লাল হয়ে উঠলো। জীবনে সে কোন দিন চড় খায়নি, সে প্রথমে হতবাক হয়ে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে। তাকিয়ে দেখে বুঝতে পারলো বাবু রেগে গেছে খুব। তাই জংলী রাণী দু'হাতে বনহুরের জামা চেপে ধরে ঝাকুনি দিয়ে কাঁদো কাঁদো স্বরে বললো—বা—বু—আ—মা—কে—নিয়ে—চ—ল ...আ—মা—কে—নিয়ে—চ—ল—

জেলে বাবা এবং অন্যান্য জেলেরা সবাই ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে লাগলো। জংলীরাণীর সব কিছু যেন অদ্ভুত লাগছে ওদের কাছে।

বনহুর বললো—জেলে বাবা আজ ওকে রেখে আসি। এরপর যখন আসবো তখন ও যেন আর জঙ্গলে ফিরে যেতে না চায়।

জেলে বাবা বললো—আচ্ছা বাবু তাই হোক।

জংলী রাণীকে লক্ষ্য করে বললো বনহুর—চলো জঙ্গলে যাই।

জংলী রাণী যাবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠে দাঁড়ালো।

ঠিক ঐ মুহূর্তে আড়াল থেকে চুমকী দাঁতে দাঁত পিষলো, আপন মনেই সে বললো—জংলীরাণী তুমি আমার স্বামীকে খুন করেছো আমি তার প্রতিশোধ নেবোই—নেবো...

বনহুর জংলী রাণী সহ বিদায় নেয় জেলেদের কাছে। জঙ্গলে পৌঁছে দিতে হবে জংলী রাণীকে, কারণ সে একা ফিরে যাবে না কিছুতেই জানে বনহুর। পথ চলতে চলতে হঠাৎ বনহুরের দৃষ্টি জংলী রাণীর গালে গিয়ে পড়ে। তার নিজের আংগুলের দাগগুলো চাবুকের মত ফুলে লাল হয়ে উঠেছে। মনে মনে দুঃখ হলো, জংলী রাণী বড্ড অবুঝ তাকে এভাবে মারা তার ঠিক হয়নি।

বনহুর বললো—খুব লেগেছে তোমার?

জংলী রাণী কিছু বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

বনহুর ওর গালে হাত বুলিয়ে বলে—ভুল করে তোমাকে আঘাত করেছি জংলী রাণী—ক্ষমা করো।

জংলীরাণী এ কথার কোন জবাব খুঁজে পায়না কারণ সে তো এখনও সব কথা কণ্ঠস্থ করতে পারেনি বা সব কথার মানেও সে বোঝেনা।

বনহুর এক সময় জংলী রাণীকে পৌঁছে দেন তার জংলী বাবা মার কাছে।

জংলী সর্দার খুশি হয়ে বনহুরকে বুকে নিয়ে আদর করে। জংলী রাণীকেও সে আদর করে একইভাবে।

ফিরে আসে বনহুর জেলে পাড়ায় তখন বেশ রাত হয়ে গেছে।

জেলে বাবা সমুদ্রের ধারে দলবল নিয়ে বাবুর জন্য প্রতিক্ষা করছিলো না জানি বাবু এতোক্ষণ আসছেনা কেনো। কি হলো কে জানে। জঙ্গলে নানা রকম ভয় আছে তাই জেলে বাবার এতো চিন্তা।

বনহুরকে ফিরে আসতে দেখে সকলের মুখে খুশি ফুটে উঠে।

বনহুর সকলের সঙ্গে জেলে পাড়া অভিমুখে এগিয়ে চলে।

এক সময় পৌঁছে যায় বনহুর জেলেদের সঙ্গে।

এতোক্ষণ হুসনা কে বনহুর দেখতে পায়নি। সে জানে হুসনা অভিমান করেছে ঐ কারণে বনহুর জেলে বাবাকে কিছু জিজ্ঞাসাও করেনি হুসনা সম্বন্ধে।

কুটিরে প্রবেশ করে বনহুর তাকায় হুসনা খাটিয়ায় শুয়ে আছে উবু হয়ে।

হুসনার পিঠে চুলগুলো এলোমেলোভাবে ছড়ানো।

বনহুরের পায়ের শব্দে হুসনা মুখ তুলে তাকায় না বা উঠে বসে না। অন্যদিন হলে সে দরজায় দাঁড়িয়ে প্রতিক্ষা করতো কেনো এতোক্ষণ মিঃ চৌধুরী আসছেন না।

আজ হুসনা কেঁদে কেঁদে এলিয়ে পড়েছে। একটা দারুণ অভিমান তাকে জর্জরিত করে তুলেছে। বনহুর ফিরে আসছে দেখেও সে অভিমানে তাকিয়ে দেখলো না।

বনহুর হুসনার দিকে তাকিয়ে হাসলো। মেয়েরা কেনো এমন হয়, সে তার কে যার জন্য হুসনা ওমন করে শুয়ে আছে। যেমন জংলীরাণী তেমনিইতো হুসনা এদের কাউকে সে কামনা করে না। বনহুর কঠিন এক পুরুষ; সবাই তাকে ভালবাসে? তাকে একান্ত আপন করে পাবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠে কিন্তু সে তো কাউকে একান্ত আপন করে চায় না। তবে ভাল সে না বাসলেও অনেককে তার ভাল লাগে।

হুসনাকেও তার ভাল লাগেনি তা নয় তবে সে ভাল লাগার মধ্যে নেই লালসার ছাপ। জংলী রাণীর অদ্ভুত চাল চলন, অদ্ভুত কথা বলার ভঙ্গী, অদ্ভুত সুন্দর চেহারা বনহুরকে অভিভূত করে তাই বলে তাকে সে ভোগের সামগ্রী মনে করে না।

বনহুর জানে হুসনা এখন অভিমানে ডগ মগ হয়ে আছে তাই সে কোন কথা না বলে চুপ চাপ শুয়ে পড়ে।

হুসনার অভিমান আরও বেড়ে যায়। সে মনে করেছিলো মিঃ চৌধুরী নিজেই আসবে তার পাশে। কথা বলবে, নানা ভাবে বোঝাবে জংলী রাণীকে আমি ভালবাসি না। কিন্তু বনহুর যখন এলোনা তখন মনে মনে অস্থির হয়ে উঠলো হুসনা। এ পাশ ও পাশ করে জানাতে চেষ্টা করলো আমি ঘুমিয়ে পড়িনি জেগে আছি।

বনহুর বুঝতে পারলো, বালিশে মুখ গুজে হাসলো সে তবু খাটিয়া ত্যাগ করলো না।

সমস্ত রাত বনহুর বা হুসনা কারো মধ্যে কোন কথা হলোনা।

খুব ভোরে উঠলো হুসনা।

বনহুর তখনও অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

হুসনার মনে দুষ্টোমি খেলে গেলো সে ভাবলো একমাত্র উপায় আছে অসুস্থের ভান করে সে কিছুতেই মিঃ চৌধুরীকে জঙ্গলে যেতে দেবেনা।

যা সে ভাবলো, করলো তাই, সমস্ত দিন হুসনা অসুস্থভাব দেখিয়ে বিছানায় পড়ে রইলো। অসহ্য যন্ত্রণায় যেন সে ছটফট করতে লাগলো!

হঠাৎ হুসনা অসুস্থ হওয়ায় বনহুর ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লো। সে হুসনার পাশে বসে তার মাথায় হাত রেখে জিজ্ঞাসা করলো—মিস হুসনা বলুন কি হলো? হঠাৎ এমন অসুস্থ হলেন কেন?

হুসনা বনহুরের কথায় কোন জবাব না দিয়ে চুপ চাপ পড়ে রইলো। মাঝে মাঝে উঃ আঃ করতে লাগলো সে।

বনহুর যেন দিশেহারা হয়ে পড়লো কারণ সে কারো কষ্ট বা ব্যথা সহ্য করতে পারতো না। জীবনে সে কারো অসুস্থ অবস্থা তেমন করে দেখেনি বা পাশে থাকেনি। এ দ্বীপে হুসনার যেমন—মিঃ চৌধুরী ছাড়া যেন তার কেউ নেই ভাবতো তেমনি বনহুরও ভাবতো হুসনা তার পরম আত্মীয়ের চেয়েও

বেশি। যখন যেখানেই যাক বা যাই করুক হুসনার কথা মনে পড়লে একটা অসীম সান্তনা আসতো তার মনে। হুসনা যেন তার অতি আপন জন। এ দ্বীপে ওরা দু'জনাই যে ছিলো স্বাভাবিক জগতের দুটি প্রাণী। একজন আর একজনের ব্যথা বেদনা বুঝতো।

হুসনার অসুস্থতা বনহুরকে ভাবিয়ে তুললো ভীষণভাবে। সে সমস্ত দিন কোথাও গেলোনা? বসে রইলো হুসনার পাশে।

মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। কখনও গরম দুধ খাওয়ালো বনহুর নিজের হাতে। ফলমূল তুলে দিতে লাগলো সে ওর মুখে।

যদিও হুসনার এ অভিনয় তার নিজের কাছে খুব ভালছিলোনা কারণ সরল সহজ মিঃ চৌধুরী তার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। কি করবেন যেন তিনি ভেবে পাচ্ছেন না। জেলে বাবাকে ধরে বসলো বনহুর—হুসনার জন্য ঔষধ দাও বাবা।

জেলে বাবা তক্ষুণি অসুখের বিবরণ শুনে ঔষধ দিলো।

নিজের হাতে বনহুর হুসনাকে ঔষধ খাইয়ে দিলো তবু হুসনা আরোগ্য হলো না। ওর অসুখটা যেন বেড়েই চলেছে।

মুহূর্তের জন্য হুসনা বনহুরকে বিছানার পাশ থেকে সরে যেতে দেয়না। বনহুরও কেমন যেন ভয় পায় হঠাৎ যদি হুসনার বেশি কিছু হয়ে বসে।

একদিন, দু'দিন তিনদিন কেটে গেলো। বনহুর হুসনাকে ছেড়ে এক দণ্ডের জন্য জঙ্গলে যেতে পারেলোনা।

হুসনা বনহুরকে সব সময়ের জন্য পাশে পেয়ে অন্তরে অন্তরে অসীম আনন্দ উপভোগ করতে লাগলো। এমনি করে ওকে যদি সে চিরদিনের জন্য পাশে পেতো, নিজের হতো তাহলে তার মত সুখী বুঝি কেউ ছিলোনা। কিন্তু হুসনা জানেনা কাকে নিয়ে সে মনে মনে কল্পনার জাল বুনে চলেছে তাকে কোন দিন একান্ত আপন করে পাবেনা।

চারদিন কেটে গেছে।

গভীর রাত।

হুসনার ঘুম ভেঙ্গে গেলো, হঠাৎ একটা শব্দ হলো যেন। চোখ মেলে তাকালো হুসনা, সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলো সে ভীষণভাবে। দরজার ঝাপ খুলে ভিতরে প্রবেশ করেছে জংলী রাণী স্বয়ং!

কুপির আলোতে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে হুসনা জংলী রাণী ঝাপ সরিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো।

ওদিকের খাটিয়ায় ঘুমাচ্ছে মিঃ চৌধুরী মৃদু নাসিকাধ্বনি হচ্ছে তার।

হুসনা ঘুমের ভান করে দেখতে লাগলো জংলী রাণী কি করে। মনের মধ্যে অবশ্য একটা দারুণ রাগ গুঁমড়ে গুঁমড়ে উঠেছিলো। তবু চুপ চাপ দেখছে।

জংলী রাণী কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করে তাকালো কুটিরের চার পাশে। হয়তো বা বাবুর সন্ধান করছে সে। যেমন বাবুর খাটিয়ার দিকে তার দৃষ্টি পড়লো অমনি সে প্রায় একরকম ছুটেই এলো—বাবু—আ—মা—র—বা—বু—

সঙ্গে সঙ্গে বনহুর জেগে উঠলো।

জংলী রাণীকে তার পাশে দেখে বিস্মিতভাবে উঠে বসলো সে বিছানায়, অস্ফুট কণ্ঠে বললো—জংলী রাণী তুমি?

বা—বু—তু—মি—যা—যা—যাও—নি—কেনো? বা—বু— কথাগুলো বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো—জংলী রাণী।

বনহুর ওর চিবুকটা তুলে ধরে বললো—ওর অসুখ ছিলো কিনা তাই যাইনি। তুমি রাতে এলে কেনো বলোতো?

বা—বু—তো—মা—কে—নি—তে......তো—মা—কে—নিতে—এ—সে—ছি—বা—বু—চ—লো।

জংলী রাণী তুমি আমার কাছে থাকো। আমি জঙ্গলে যেতে পারবোনা। এখানে জেলে বাবা আছে, জেলেরা আছে তুমি থাকলে তারা অনেক খুশি হবে।

হুসনা নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনছে মিঃ চৌধুরী আর জংলী রাণীর অদ্ভুত কথাগুলো। কি বলে তারা জানতে চায় হুসনা।

বনহুরের কথায় জংলী রাণী বলে উঠে—বা—বু—তো—মা—র—কাছে—আ—মা—কে—থা—ক—তে—দে—বে—ও—রা?

কেনো দেবে না। ঐ তো তোমার মত আমার আর একটি বান্ধবী আছে। ঐ দেখো ঘুমাচ্ছে......

তো—মা—র—বা—ন্ধ—বী—

হ্যাঁ। তুমি যেমন তেমনি হুসনা।

জংলী রাণী বলে—হু—স—না?

হাঁ।

জংলী রাণী তার দিকে পা বাড়ালো।

হুসনা ভাবলো জংলী রাণী এসে তাকে কি বলে ডাকে দেখবে কিন্তু বনহুর বললো—ওখানে যেওনা......ওর অসুখ। চলো তোমাকে রেখে আসি......

জ—ঙ্গ—লে—যা—বে?

না জঙ্গলে নয় জেলে বাবার কাছে।

না—ও—খা—নে—যা—বো—না। তো—মা—মা—র—কা—ছে—থা—ক—বো

বেশ বসো।

জংলী রাণী না বসে শুয়ে পড়লো ওর বিছানায়।

হুসনার নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে গেলো। না জানি এবার সে কি দেখবে। চুপ করে রইলো কতকটা মৃতের মত।

জংলী রাণী বনহুরের পাশে শুয়ে পড়তেই বনহুর সরে বসলো একটু দূরে! জংলী রাণী খাটিয়ায় শুয়ে দোল খেতে লাগলো, সে এমন জিনিসে কোন দিন শোয়নি কিনা তাই তার আনন্দ ধরছে না।

বনহুর বললো—জংলী রাণী চোখ বন্ধ করে দোল খাও। বন্ধ করো এই আমার মত করে......বনহুর নিজে চোখ বন্ধ করে দেখালো।

জংলী রাণী চোখ বন্ধ করলো।

বনহুর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু শিস দিচ্ছিলো।

অল্পক্ষণে ঘুমিয়ে পড়লো জংলী রাণী।

বনহুর এবার ধীরে ধীরে খাটিয়া ছেড়ে নেমে এলো নিচে। একটা খেজুর পাতার চাটাই ছিলো এক পাশে সেটা সে মেঝেতে বিছিয়ে নিয়ে শুয়ে পড়েলো চীৎ হয়ে।

হুসনার মন এক অপূর্ব অনুভূতিতে ভরে উঠলো। মিঃ চৌধুরী তাকে যেমন ভালবাসে তেমনি জংলী রাণীকেও তার বেশি নয়।

ঘুমিয়ে পড়ে বনহুর।

হুসনাও ঘুমিয়ে পড়ে।

ধীরে ধীরে কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করে চুমকী। দু'চোখ তার আগুনের ভাটার মতো জ্বলছে। কুটিরে প্রবেশ করে প্রথমেই কুপিটা নিভিয়ে ফেলে তারপর জংলী রাণীর খাটিয়ার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

জংলী রাণীর গায়ে হাত রেখে ডাকে—জংলী রাণী উঠো বাবু তোমাকে ডাকছে।

জংলী রাণীর শরীরে ধাক্কা পড়ায় সে চোখ রগড়ে উঠে বসে, তারপর তাকায় অন্ধকারে কিছু সে দেখতে পায় না। চুমকী বলে—জংলী রাণী বাবু ডাকছে...

বা—বু—ডা—ক—ছে?

হাঁ আমার হাত ধরে চলো।

চুমকীর হাত ধরে জংলী রাণী বেরিয়ে আসে কুটিরের বাইরে।

জংলীরাণী বলে—বা—বু—কই?

আছে। আমার সঙ্গে এসো জংলী রাণী।

চুমকীর হাত ধরে এগোয় জংলী রাণী।

অনেকটা পথ নিয়ে আসে চুমকী ওকে।

জংলীরাণী বলে—বা—বু—কো—থা—য়?

আছে। আরও চলো। হাঁ এবার আমার হাত ছেড়ে দাও জংলীরাণী।

জংলী রাণী চুমকীর হাত ছেড়ে দিলো।

বললো চুমকী—এবার তুমি একা যাও ঐ ঝোপটার পাশে বাবু তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।

জংলী রাণী পা বাড়ায়।

সম্মুখে চোরাবালির স্তূপ। ভুল করেও এদিকে কেউ কোনদিন আসেনা, এলে সে ফিরে যায় না।

জংলী রাণী এগিয়ে যায়।

চুমকী বলে—যাও জংলী রাণী আরও যাও। বাবু তোমায় ডাকছে যেমন করে রাজু আমাকে ডাকছে দূর থেকে তেমনি তোমাকে ডাকছে যাও...

জংলী রাণী এবার সোজা চোরাবালির মধ্যে এসে পড়লো। তবু হাঁটতে চেষ্টা করছে জংলী রাণী কারণ সে চোরাবালি জানে না চেনে না।

ক্রমে পা অবধি তলিয়ে গেলো।

তারপর হাটু অবধি।

তবু জংলী রাণী চেষ্টা করছে এগুতে কিন্তু এক চুল সে এগুতে পারছেনা। ধীরে ধীরে কোমর অবধি বসে গেলো তার চোরাবালির মধ্যে। জংলী রাণী ডাকলো...বা—বু—তু—মি—কো—থা—য়...বা—বু—তু—মি—কো—থা—য়...বা—বু—

জংলী রাণীর বুক অবধি তলিয়ে গেলো।

চুমকী বলছে—জংলী রাণী যতই জোরে ডাকো না কেনো বাবু শুনতে পাবে না...তুমি আমার রাজুকে খুন করেছো আমি তোমাকে খুন করলাম।

জংলী রাণীর মুখ অবধি তলিয়ে গেছে, অস্পষ্ট শোনা গেলো—বা—বু—তু—মি—কো......

সমস্ত শব্দ মিশে গেলো চোরাবালির অতলে।

চুমকি এবার ফিরে চললো জেলে পাড়ায়।

পরবর্তী বই

লাল চিঠি